যোগেন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী।

সমাজ-চিত্র।

লীলা, সূর্য্যমুখী, প্রেমের জয়, বাল-বিধবার সুখ, বিষময় ফল, সতীর স্বর্গারোহণ, কনক-লতা, মানবী না দানবী, হরগৌরী-মিলন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

[তৃতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী ষ্টীম মেসিন যন্ত্র হইতে

শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২১ সাল।

যোগেন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী।

সমাজ-চিত্র।

লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের নাম বিজয়নগর। নামটী জমকাল বটে, কিন্তু গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র। আট দশ ঘর ব্রাহ্মণ, পাঁচ সাত ঘর কায়স্থ, আর দশ পনর ঘর অন্যান্য জাতি—এই লইয়া বিজয়নগর গ্রাম। এই গ্রামে লোকনাথ ঘোষের নিবাস। লোকনাথ জাতিতে কুলীন কায়স্থ। অবস্থা অতি হীন, জমাজমীর বাৎসরিক আয়—ত্রিশটী টাকা মাত্র। লোকনাথ কিন্তু এই অবস্থাতেই সুখী। কারণ, লোকনাথ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট। অবস্থাতিরিক্ত কোনরূপ উচ্চাভিলাষ তাহার ছিল না। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা কাহাকে বলে লোকনাথ তাহা জানিত না। অর্দ্ধাশনেই হউক, কিম্বা পূর্ণাশনেই হউক, কোন প্রকারে দিন অতিবাহিত হইলেই লোকনাথের আনন্দের সীমা থাকিত না। তবে স্বদেশে কিম্বা সমাজের উন্নতিকল্পে লোকনাথের কোনরূপ অনুষ্ঠান ছিল না। দরিদ্র লোকনাথের নিকট স্বদেশ কিম্বা সমাজ কি উন্নতির আশা করিতে পারে?

লোকনাথের ভার্য্যার নাম—বিন্দুবাসিনী। বিন্দুবাসিনীর নামকরণের উপর যদি আমাদের কোন হাত থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাহার নাম বিন্দুবাসিনী না রাখিয়া আনন্দময়ী রাখিতাম। বাস্তবিক, বিন্দুবাসিনী সদাই হাস্যময়ী, দরিদ্র লোকনাথের ভার্য্যা এত হাসি কোথায় পায়, অনেকেই তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না? সে হাসি অতি মধুর—অতি মৃদু। সৌদামিনীর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না, কারণ, সৌদামিনী বড় তীব্র—বড় অস্থির। জ্যোৎস্নার সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে না; কারণ, জ্যোৎস্না বড় কোমল, বড় স্থির। অথচ সৌদামিনী অথবা জ্যোৎস্নায় যাহা আছে, এ হাসিতেও তাহা বর্ত্তমান। দরিদ্র লোকনাথের আবার

সংসার—সর্ব্বদাই এই হাসি আলোকিত রাখিত।

বিন্দুবাসিনী কেবল হাসিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত না। সাংসারিক সমস্ত কাজকর্ম্মও স্বহস্তে করিত; এবং ইহা ব্যতীত কুলান অকুলানের প্রতিও তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সেই কারণ, সে হাসি লোকনাথের বড়ই মধুর বোধ হইত। লোকনাথের গৃহের চারিধারে যে সকল সময়োপযোগী শাক্ সবজী দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল বিন্দুবাসিনীরই স্বহস্তে রোপিত ও আন্তরিক যত্নে বর্দ্ধিত। তাহার দ্বারা অনেকটা সাংসারিক কুলান-অকুলানের সাহায্য হইত। কেবল শাক্‌সবজী নয়, কাট্‌না কাটিয়াও বিন্দুবাসিনী সময়ে সময়ে লোকনাথকে অর্থ সাহায্য করিত। ফল কথা —বিন্দুবাসিনী তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করিতে জানিত না। কোন প্রকার কাজ হাতে থাকিলেই বিন্দুবাসিনী আনন্দময়ী, আর কাজ হাতে না থাকিলেই বিন্দুবাসিনী বিষাদময়ী। তবে দুঃখের সংসারে কাজের অভাব থাকে না। ঘটনাক্রমে পীড়া বশতঃ যদি বিন্দুবাসিনীকে দুই এক দিন বিশ্রাম করিতে হইত, সে কয়েক দিন পীড়ার যন্ত্রণা অপেক্ষা বিশ্রামের যন্ত্রণা বিন্দুবাসিনীর পক্ষে অধিকতর কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইত।

সংসারে এই বিন্দুবাসিনী ব্যতীত লোকনাথের আর কেহই ছিল না। এই দরিদ্র দম্পতী সুখদুঃখ সমজ্ঞান করিয়া প্রফুল্ল মনে দিন অতিবাহিত করিত। ইহাদের মনে কোনরূপ কামনাই ছিল না; এমন কি মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ সন্তানকামনা পর্য্যন্ত তাহাদের মনে কখন উদয় হয় নাই। কিন্তু কামনা না থাকিলেও অনেক সময়ে কাম্যবস্তু লাভ হয়। এই দম্পতীর অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। ত্রিশ বৎসর বয়সে বিন্দুবাসিনী এক কন্যারত্ন প্রসব করিল। সেই কন্যার নাম রাখা হইল—লীলা।

কন্যার মুখ দেখিয়া জননীর অপত্যস্নেহ একবারে উথলিয়া উঠিল। লোকনাথও আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু সে আনন্দলহরী বিন্দুবাসিনীর আনন্দস্রোতের সহিত মিলিতে পারিল না। কারণ, কন্যাকে কিরূপে লালনপালন করিবে, এ চিন্তা তখন লোকনাথের মনে উদয় হইয়াছিল। এত দিন দরিদ্র হইয়াও দরিদ্রযন্ত্রণা কাহাকে বলে, লোকনাথ তাহা জানিত না। যে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, তাহার আবার দরিদ্রযন্ত্রণা কেন থাকিবে?

পূর্ব্বে আপনার হীনাবস্থার বিষয় লোকনাথের চিন্তার বহির্ভূত ছিল, কন্যা জন্মিবার পর কিন্তু লোকনাথের মনে সে কথা জাগিয়া উঠিল। সুতরাং একটা অপরিবর্ত্তনশীল মনের এইবার পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিন্দুবাসিনীর মনে কিন্তু সেরূপ কোন চিন্তার উদয় হয় নাই। সেই কারণ, তাহার আনন্দস্রোত অবাধে বহিত। সেই অপত্যস্নেহ পরিপূর্ণ চিরপ্রফুল্ল কোমল হৃদয়ে কি সেরূপ কোন মর্ম্মস্পর্শী চিন্তানল প্রজ্বলিত হইতে পারে?

কন্যার বয়স যখন পাঁচমাস, তখন একদিন বৈকালে বিন্দুবাসিনী ঘরের দাওয়াতে বসিয়া কন্যাকে আদর করিতেছিল, শিশুকন্যাটি প্রৌঢ়া বিন্দুবাসীর অনুকরণে ক্ষুদ্র অধরে ক্ষুদ্র হাসির লহরী তুলিতেছিল। সে লহরী ক্ষুদ্র হইলেও তাহা বিন্দুবাসিনীর হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। নিকটেই লোকনাথ অন্যমনস্কে কি চিন্তায় নিমগ্ন। বিন্দুবাসিনীর আনন্দসাগর তখন উথলিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং লোকনাথকে সে আনন্দের অংশী করিবার

কন্যা বলিল—"ব'সে কি ভাব্‌ছ? একবার চেয়ে দেখ—আমার সোণার চাঁদ তোমার আঁধার ঘর কেমন আলো করে রয়েছে।"

লোকনাথের তখন অন্য চিন্তা দূরে গেল—একবার কন্যার প্রতি সস্নেহনয়নে চাহিল। অমনি কন্যাটি পুনরায় হাসির লহরী তুলিল, সে লহরী এবার লোক-নাথের হৃদয়েও গিয়া পৌঁছিল। লোকনাথ তখন আর থাকিতে পারিল না; আনন্দে অধীর হইয়া কন্যার মুখচুম্বন করিল। বিন্দু-বাসিনী সে দৃশ্য দেখিয়া কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? বিন্দুবাসিনীও তখন আনন্দে বিহ্বল। সে আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কন্যার সেই সুকোমল অধর একবারে অসংখ্য চুম্বনে আরক্তিম করিল। বারংবার চুম্বনের বেগের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, বিন্দুবাসিনী বলিল—"এচাঁদ যার ঘর আলো করে, তার আবার কিসের ভাব্‌না?"

লোকনাথের মুখ আরো প্রফুল্ল হইল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই সময় তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রু মুছিয়া লোকনাথ বলিল—"আবার কিসের ভাবনা বিন্দু? কেবল তোমার ঐ চাঁদের ভাবনা। আমি ভাব্‌ছিলাম—আজ একটু দুধ কোথায় পাই।"

বিন্দু। দেখ, আমার স্তনের দুধে বাছার আর কুলায় না, একটু দুধ কিন্তু চাই। তুমি আর বসে ভেবো না, একবার সে চেষ্টায় যাও।

লোক। কিন্তু যাই কোথায়? পয়সা না পেলে কে আমায় দুধ দেবে?

বিন্দু। ভগবান যদি আমার বাছার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তনের দুধ বাড়িয়ে দিতেন, তা হলে আর এ ভাবনা থাক্‌তো না।

লোক। তোমার স্তনের দুধ বাড়্‌বে কোথা থেকে? এখন কি আমি তোমায় তেমন খেতে দিতে পারি? প্রসব হয়ে পর্য্যন্ত তুমি প্রায় আধপেটাই যে খাও।

বিন্দু। তা হ'ক। যদি আমার সোণার চাঁদের কোন কষ্ট না হয়, তাহলে আমি এখন যা খাই, তার অর্দ্ধেক খেয়েও সুখে থাক্‌তে পারি।

লোক। তা হলে কি করে বাঁচ্‌বে?

বিন্দু। কেন বাঁচ্‌বো না? আমার শরীরের রক্ত মেপে নিয়ে কেউ যদি আমার বাছার জন্যে সেই মাপে দুধ দেয়, তা:হলেও আমার কোন কষ্ট হবে না—তা হলেও আমি মর্‌বো না। এ চাঁদমুখ দেখ্‌লে কি আবার মর্‌তে ইচ্ছা করে?

লোক। কষ্ট না হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু কারো হাত ধরা নয়।

বিন্দু। আচ্ছা, এক কর্ম্ম কর না। জিনিষ পত্র যা কিছু আছে, বেচে কিনে—আমার সোণার চাঁদের দুধের যোগাড় কর।

লোক। জিনিষ পত্র আর কি আছে? কেবল ঘটী, বাটী, বইত নয়? তা না থাক্‌লে কি আর সংসার চলে?

বিন্দু। কেন চল্‌বে না? পিতল কাঁসার ঘটীতে জল খেলেও যে স্বাদ, মাটির ঘটীতে জল খেলেও সেই স্বাদ। আর ঘাটে গিয়া আঁজ্‌লা করে জল খেলেও সেই স্বাদ। তবে কেন চল্‌বে না?

তখন অকস্মাৎ লোকনাথ যেন অগাধ চিন্তাসাগরের কূল পাইল আর কোন কথা না কহিয়া একটী ঘটীহস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ দুঃখে ও কষ্টে লীলা প্রতিপালিতা হইতে লাগিল। আমরা জানি—লীলা কিন্তু কোনরূপ দুঃখ বা কষ্ট পায় নাই। কারণ, তাহার জনকজননী লীলার জন্য সকল দুঃখ ও কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিত। আর লীলার কোনরূপ অভাব হইলে, বিন্দুবাসিনীর আদর ও যত্নে সে অভাব পূরণ হইয়া যাইত।

দরিদ্র লোকনাথপত্নীর আদর ও যত্নের কথা শুনিয়া হয় ত অনেকেই হাসিবেন, কিন্তু আমরা এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এই দরিদ্র-কন্যা যেরূপ আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইতেছিল, অসংখ্য দাস-দাসীর দ্বারা প্রতিপালিত রাজকন্যাও সেরূপ আদর ও যত্ন কখন পায় নাই!

লীলা যখন আধ আধ কথায় 'মা-মা, বা-বা' বলিত, তাহার জনক-জননীও সে-সময় সকল দুঃখ ও সকল কষ্ট ভুলিয়া গিয়া অপার সুখসাগরে সন্তরণ করিত। বিন্দুবাসিনী লীলাকে কোলে লইয়া সাংসারিক প্রায় সকল কর্ম্মই করিতে পারিত। সময়ে সময়ে লোকনাথের কোলে গিয়াও সেই ক্ষুদ্র শিশু ক্ষুদ্র হাসির লহরী তুলিত। এই কোল-পরিবর্ত্তনের সময় লীলার আনন্দ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিবার জন্যেই কেবল লোকনাথকে সময়ে সময়ে কন্যা কোলে লইতে হইত। লীলা কিন্তু অধিক ক্ষণ পিতার কোলে স্থির থাকিতে পারিত না, অল্পক্ষণ পরেই জননীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুনরায় হাসির লহরী তুলিত! জননীর কোল হইতে পিতার কোল এবং পিতার কোল হইতে জননীর কোল—এইরূপ কোল-পরিবর্ত্তনে সেই বালিকা যে কেন এত আনন্দ অনুভব করিত, তাহা তাহার জনকজননী কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না।

ক্রমে যখন লীলার বয়স দেড় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল—লীলা যখন পা পা করিয়া হাঁটিতে শিখিল, তখন আর লীলাকে সর্ব্বদাই কোলে লইয়া থাকিতে হইত না। এখন হইতে জননী যখন গৃহ-কর্ম্ম করিত, লীলা সে সময় তাহার অঞ্চল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। জননী যখন চরকা কাটিতে আরম্ভ করিত, লীলা তখন এক পার্শ্বে বসিয়া সেই ঘূর্ণায়মান চরকার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, এবং তাহার মধুর শব্দে বিমোহিত হইত। এই শিশু-কন্যার প্রকৃতি দেখিয়া জনকজননী বিস্মিত হইত। লীলাকে কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই, এমন কি ক্ষুধায় অস্থির হইলেও সে কখন কাঁদিতে জানিত না। লীলার এই সকল অসাধারণ গুণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কিন্তু অনেক সময় তাহার জনক-জননী কাঁদিয়া ফেলিত। জনক-জননীর চক্ষে জল দেখিলেই কিন্তু লীলা অস্থির হইয়া "মা চুপ কল্—বাবা চুপ কল্" বলিয়া আব্দার ধরিত। অন্য কোন প্রকার শিশুসুলভ আব্দার করিতে আমরা লীলাকে কখনও দেখি নাই।

লীলার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন একদিনকার বৈকালের ঘটনার কথা বলি—শোন। পল্লীগ্রামের সামান্য অবস্থার স্ত্রীলোকে প্রায়ই বৈকালে গাত্র ধৌতকালে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ নানা প্রকার শাকসবজী ও অন্যান্য বৃক্ষাদিতে জলসেচন করিয়া থাকে। বিন্দুবাসিনীও একদিন বৈকালে এইরূপ জলসেচন করিতেছিল। জননীর দৃষ্টান্তের অনুকরণে লীলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র কক্ষে একটি ঘটী লইয়া জলসেচন আরম্ভ করিল। লীলাকে এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম

রতে নিষেধ করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিল "লীলা তুমি কেন মা, আমার সঙ্গে সঙ্গে ছে জল দিতে এসেছ?"

লীলা তখন প্রফুল্লমুখে ধীরে ধীরে উত্তর রল—"আমি একলা বসে কি করবো মা?"

বিন্দু। তুমি বোসেদের খুদীর সঙ্গে লা কর না গে মা।

লীলা। না মা, আমি খুদীর সঙ্গে লা করবো না মা,—আমি তোর সঙ্গে লা করবো। তুইও গাছে জল দে— মিও তোর সঙ্গে সঙ্গে গাছে জল দি— যে বেশ খেলা মা।

বালিকার কথা শুনিয়া বিন্দুবাসিনী নেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল। তার পর নরায় বলিল—"হা আবাগি! একি তোর লা? দুঃখিনীর গর্ভে জন্মেছিস্ বলে কি ধাতা তোকে এমন খেলা খেল্‌তে খিয়ে দিয়েছেন?"

লীলা এইবার আগ্রহের সহিত বলিল —"হাঁ মা, তুই আর বাবা অনেক সময় ঃখ—দুঃখ বলিস্, তা দুঃখ কাকে বলে া? তোর পায়ে পড়ি—দুঃখ কাকে বলে ল্‌না মা?"

মূর্ত্তিমান দুঃখের ক্রোড়ে পালিতা বালি- কার মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তখন জননীর ক্ষে জল আসিল, কিন্তু তিনি তখন সে জল গোপন করিয়া বলিলেন—"বড় হলে মা, দুঃখ দেখতে পাবে, ছোট বেলায় কেউ সে দুঃখকে দেখ্‌তে পায় না।"

লীলা। আমি ত মা বড় হয়েছি। বাবা যে সে দিন বলেছিল—'আমার লীলা এখন বড় হয়েছে।'

বিন্দু। আরো বড় হও মা, তখন সব বুঝ্‌তে পারবি। তখন আমার মতন গাছে জল দিও, সংসারের কাজকর্ম্ম করো, এখন তোমার যে কষ্ট হবে মা।

লীলা। মা, এতে তোর কি কষ্ট হয়?

বিন্দু। না।

লীলা। তবে আমার কষ্ট হবে কেন?

বিন্দু। কষ্ট না হ'ক, জল ঘেঁটে তোমার যদি অসুখ করে মা।

বালিকার ইতঃপূর্ব্বে একবার অসুখ করিয়াছিল, সুতরাং বালিকা অসুখের যন্ত্রণা বিলক্ষণ জানিত। এইবার জননীর কথা শুনিয়া বালিকার চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বালিকা ছল্ ছল্‌নেত্রে বলিল—'হঁা মা—তবে জল ঘেঁটে ঘেঁটে তোরওত অসুখ হ'তে পারে।"

আবার বস্ত্রাঞ্চলে কন্যার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া জননী বলিল—'না, এতে আমার অসুখ হবে না।"

জননীর কথা শুনিয়া বালিকা, এবার একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"তবে আমার হ'বে কেন?"

বিন্দুবাসিনী কিন্তু এ 'কেনর' আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন মাতাকন্যায় একত্রে জলসেচন আরম্ভ করিল। মাতা বড় কলসী কক্ষে নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া লাউ, কুমড়া, শাক প্রভৃতি এবং অন্যান্য বৃক্ষ সকলে জল- সেচন করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লীলাও একটি ঘটী কক্ষে লইয়া মাতার— অনুকরণে—জলসেচন করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে লীলা এত অল্প বয়স হইতেই মাতাকে সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। অন্যান্য বালিকার ন্যায় লীলা খেলিয়া বেড়াইত না। কোন বালক বালিকা লীলাকে খেলিতে ডাকিলেও প্রায় লীলা তাহাদের সহিত খেলিতে যাইত না। সে কেবল মাতার সহিত গৃহকর্ম্মের খেলা খেলিতে ভাল বাসিত। সন্ধ্যার সময়

চন্দ্রের আলোতে বিন্দুবাসিনী যখন সূতা কাটিতে বসিত, লীলা তখন ধীরে ধীরে জননীর নিকট বসিয়া তুলা পিঁজিতে আরম্ভ করিত। ক্রমে বালিকা মাতার নিকট হইতে সূতা লইয়া নিকস্থ হাটে বিক্রয় করিয়া আসিতেও শিখিয়াছিল। একজন প্রতিবাসিনী লীলাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিত। সে নীচবংশীয়া হইলেও লীলা তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে লীলা শৈশব হইতেই ক্রমে ক্রমে জননীর জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল। জননী কোন কাজ করিতে না দিলে লীলার সেই প্রফুল্ল মুখকমল বিষণ্ণ হইত। কিছুক্ষণ কোন কাজ করিতে না পাইলে, জননীর ন্যায় লীলাও অস্থির হইয়া পড়িত।

পূর্ব্বে বিন্দুবাসিনী সূতা হাটে বিক্রয় করিবার জন্যে কোন নীচবংশীয়া স্ত্রীলোকের সাহায্য গ্রহণ করিত। সে অনুগ্রহ করিয়া যাহা কিছু দিত, বিন্দুবাসিনী তাহাই যথেষ্ট মনে করিত। এখন কিন্তু লীলা নিজে সেই কর্ম্মের ভার লইয়াছে, গ্রামের সেই নীচবংশীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে লীলা প্রতি হাটবারে সূতা বিক্রয় করিতে হাটে যায়, এবং সূতা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পায়, আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে গৃহে আসিয়া জননীর অঞ্চলে বাঁধিয়া দেয়। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরে সূতা বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া, জননীও বিস্মিতনেত্রে লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিত।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এইরূপ হাট হইতে সূতা বিক্রয় করিয়া লীলা গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ আকাশে একখানি কাল মেঘ উঠিয়া ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সুতরাং লীলা ও তাহার সঙ্গিগণ যে যেখানে পাইল, সে সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সৌভাগ্য ক্রমে সম্মুখে এক অট্টালিকা দেখিয়া, লীলা সেই অট্টালিকার বারান্দার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ঝড় ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া সেই অট্টালিকার বৈঠকখানায় যে যুবা বসিয়াছিলেন, তিনি জানালা বন্ধ করিতে গেলেন। কিন্তু জানালা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন—একটি অষ্টম বৎসরের সুন্দরী বালিকা সেই জানালার বাহিরে জলঝড়ে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। জলের ঝাপ্‌টায় বালিকার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে। বালিকা ভীতমনে দেওয়ালের গায়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছে। এই সময় বালিকা একবার জানালার দিকে চাহিল। আ মরি! মরি! এ কি মর্ত্ত্যলোকের বালিকা, না বালিকাবেশে কোন স্বর্গীয়া দেবী? যুবকের আর জানালা বন্ধ করা হইল না, একদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন— দেখিলেন, সিঞ্চিতশুভ্রজলকণা বালিকার সুকৃষ্ণকেশগুচ্ছের উপর পড়িয়া যেন অসংখ্য শুভ্র বড় বড় মুক্তাফলের অপূর্ব্ব-শোভা ধারণ করিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সেই ভীতিসঙ্কুচিত মুখমণ্ডলের শ্রীই বা কি সুন্দর দেখাইতেছে!

হঠাৎ যুবার চৈতন্য হইল। তখন যুবা সেই বালিকাকে গৃহের মধ্যে আসিতে বলিলেন। বালিকা কিন্তু তাহাতে যেন আরও ভীত হইল। কারণ, সেই সুসজ্জিত গৃহের মধ্যে আসিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। এই সময় একজন ভৃত্য সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বা বালিকাকে গৃহে আনিতে সেই ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন। ভৃত্য বাহিরে গিয়া একবার ডাকিবামাত্র বালিকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গৃহের মধ্যে আসিল। ভৃত্য বালিকার পরিচিত ছিল। বালিকার সেই আর্দ্রবস্ত্রখানি পরিবর্ত্তনের জন্যে যুবা প্রথমেই ভৃত্যকে একখানি কাপড় আনিতে বলিলেন। বালিকা কিন্তু কোন ক্রমেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে রাজি হইল না। এই সময় সেই গৃহে আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। নবাগন্তক প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"কি সোমনাথ, লীলাকে কোথায় পেলে ?"

আমাদের প্রথম পরিচিত যুবকের নাম সোমনাথ। সোমনাথ কলিকাতার কলেজে পড়েন। কলিকাতা হইতে তাঁহার সহপাঠী বন্ধু নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এই নব আগন্তকই তাঁহার সেই সহপাঠী বন্ধু নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নে সোমনাথ বলিলেন—"তুমি কি এ মেয়েটিকে চেন ?"

নরে। এ মেয়েটি পশ্চিম পাড়ার লোকনাথের কন্যা। লোকনাথ অতি গরীব, কিন্তু এমন ভাল লোক এ গ্রামে নাই। তার স্ত্রী আর এই কন্যা ছাড়া সংসারে আর কেউ নাই, এরাও খুব ভাল। গ্রামশুদ্ধ লোকে এদের সুখ্যাতি করে থাকে।

তার পর, বালিকার প্রতি চাহিয়া নরেন্দ্র বলিলেন—"তুই এই জলঝড়ে কোথায় গিয়েছিলি গো ?"

লীলা তখন সাহস করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আমি হাটে গিয়েছিলাম।"

নরে। আজ তো সীতাপুরের হাট—এখান হ'তে প্রায় এক ক্রোশ পথ, অত দূরে কিসের জন্য গিয়েছিলি ?

লীলা। সুতো বেচ্‌তে।

লীলার কথা শুনিয়া সোমনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এত ছোট মেয়ে অত দূরে সুতো বেচ্‌তে গিয়েছিল! এরা কি জাত ?"

নরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"কায়স্থ। তোমাদেরই স্বজাতি।"

সোম। এর আর কে আছে ?

নরে। সে কথাত পূর্ব্বেই বলেছি—কেবল বাপ-মা আছে, আর কেউ নাই। মেয়েটি তাঁদের বড় আদরের।

সোম। আদরের প্রমাণ সুতো বেচতে পাঠানতেই প্রকাশ পেয়েছে।

নরে। না হে—শুনেছি মেয়েটি বড় পরিশ্রমী। এই বয়সেই সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম শিখেছে। আপনি ইচ্ছে করেই নাকি এই সকল কাজ করে; কারণ, এদের অবস্থা অতি শোচনীয়।

নরেন্দ্রনাথের সহিত সোমনাথের যখন এই সকল কথা হইতেছিল, তখন লীলা অবাক্ হইয়া সোমনাথের মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, হঠাৎ এই সময় সোমনাথের দৃষ্টি লীলার মুখের প্রতি পড়িল। তিনি প্রথমে বালিকার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বালিকার এই অসাধারণ গুণের কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন। বালিকার দুঃখে তাঁহার বিশেষ সাহানুভূতি জন্মিল। তিনি লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ সুতো বেচে কি পেয়েছ ?"

লীলা আর্দ্রবস্ত্রের অঞ্চলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ কয়েক আনার পয়সা দেখাইল। সোমনাথ তখন আপনার পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া লীলার সেই বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিতে গেলেন, লীলা কিন্তু কোন মতেই সেই টাকা লইতে স্বীকৃত

হইল না। লীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলিল—"আমি টাকা চাই না।"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"লীলা, যখন ইনি তোমায় দিচ্ছেন, তখন তুমি নিতে পার, এতে কোন দোষ নাই।"

লীলা উত্তর করিল—"মা বলেছেন—কেবল সুতো বেচে টাকা পয়সা নিতে আছে, অমনি কারো কাছ থেকে টাকা কি পয়সা নিতে নাই।"

সোমনাথ বালিকার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"দেখ লীলা, আমার কিছু সুতোর বড় দরকার, তুমি আমার সুতো বেচ্‌বে?"

লীলার মুখ পুনরায় প্রফুল্ল হইল। লীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত একটি সুতার পুঁটুলি বাহির করিল। সোমনাথ হাসিতে হাসিতে সেই পুঁটুলিটী লইয়া লীলাকে পাঁচটি টাকা দিলেন। কিন্তু এবারও লীলা বলিল—"আমি টাকা নেব না, এর দাম সাড়ে চার আনার পয়সা।"

সোম। তুমি ছেলে মানুষ, তুমি এর দাম কি জান? এর দাম পাঁচ টাকা।

লীলা। আমি এর দর বেশ জানি। সাড়ে চারি আনা কি কোন হাটে বড় জোর পাঁচ আনা হয়। এর বেশী কখন হয় না। ওগো সুতো বেচে কখন একটা টাকাও পাই-নি। আর আমাদের টাকার কখন দরকার হয় না, পয়সা পেলেই আমাদের খরচ চলে। আমি টাকা নিয়ে কি কর্‌বো?

সোম। তোমার মাকে দিও।

লীলা। মা টাকা নিয়ে কি কর্‌বে? কই মার কাছে কখনত একটিও টাকা দেখি-নি। তবে খাজনা দেবার সময় হলে বাবা পয়সা জমিয়ে টাকা করে—খাজনা দেয়।

সোম। তবে এ টাকা তোমার বাপকেই খাজনা দেবার জন্তে দিও।

লীলা। সে দিন যে খাজনা দেওয়া হয়ে গেছে, এ বৎসর ত আর খাজনা দিতে হবে না।

"তবে আমি তোমার সুতো চাই না।"—ব'লিয়া সোমনাথ সেই পুঁটুলিটী পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু বাঁধিয়া দিবার সময় বালিকার অজ্ঞাতে একখানি নোট সেই পুঁটুলির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু সোমনাথ ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহাকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিলেন।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল, সুতরাং লীলা আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে চলিল। এই সময় নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন—সোমনাথ তখনও এক দৃষ্টে লীলার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহার গণ্ডস্থল হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

নরেন্দ্রনাথ সোমনাথের প্রকৃতি জানিতেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে অশ্রুর অর্থ বুঝিলেন। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। তার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনরায় ঐ অসাধারণ বালিকার কথাই চলিতে লাগিল।

এখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গেলেও এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জ্জন ও বিদ্যুতের আলো সকলকে চমকিত করিতেছিল। ভেক ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার রবে চারিদিক কম্পিত হইতে-ছিল। ক্রমে অন্ধকার চারিদিকে ঘুরিয়া

ঘুরিয়া বের করাই দিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় সেই অন্ধকাররাশি ঠেলিয়া সেই ক্ষুদ্র বালিকা লীলা পুনরায় সেই বৈঠক-খানায় আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথ ও সোমনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির পশ্চাতেই সেই বালিকার পিতা—লোকনাথ ঘোষ। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘোষজা মহাশয়, কি মনে করে?"

লোকনাথ নরেন্দ্রনাথকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া বলিল—"চাটুর্য্যে মহাশয়, লীলার সূতার পুঁটুলির ভিতর একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট পাওয়া গিয়াছে। লীলার মুখে যে সকল কথা শুনেছি, তাতে সে নোট খানি আপনাদেরই বলে বোধ হয়। দেখুন দেখি—এ নোট খানি আপনাদের কি না?"

এই বলিয়া লোকনাথ একখানি নোট বাহির করিয়া দেখাইল। তার পর অতি বিনীতভাবে বলিল—"আমায় ক্ষমা কর্‌বেন, ভিজে সূতার সঙ্গে ছিল বলে নোট খানি ভিজে গিয়েছে, এতে কি কোন ক্ষতি হবে? দিনের বেলা হলে রৌদ্রে শুকিয়ে দিতে পারতাম। আগুনে কি প্রদীপের আলোয় শুকুতে আমার কেমন ভরসা হলো না।"

লোকনাথের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ সোমনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। সোমনাথ তখন বলিলেন—"ও নোট আমি আপনার কন্যাকে দিয়াছি।"

লোকনাথের মুখে আর কথা নাই। তিনি অবাক্ হইয়া সেই অপরিচিত যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"মহাশয়, আমরা অতি গরীব বটে, কিন্তু কখন ভিক্ষা করি না।"

তার পর বালিকার প্রতি চাহিয়া আদরে ডাকিয়া বলিলেন—"কি লীলা, তুই কি ইহাঁর কাছে কিছু চেয়ে ছিলি না?"

লীলার মুখখানি অমনি শুকাইয়া গেল। হঠাৎ এই সময় একটা বাতাস আসিয়া কিন্তু সেই আর্দ্র চুলে সেই শুষ্ক মুখ খানি ঢাকিয়া ফেলিল। লীলা ডানহস্তে ধীরে ধীরে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া বলিল—"না বাবা, আমিত ইহার কাছে কিছুই চাই-নি।"

সোমনাথ বলিলেন—"না লীলা, তুমি আমার কাছে কিছুই চাও নাই। কিন্তু মনে কর না কেন, তুমি আমার একটী ছোট বোন, ছোট বোন না চাইলে কি বড় ভাই তাকে কিছু দেয় না?"

লীলা এইবার অহ্লাদিত হইয়া বলিল—"হাঁ বাবা, ইনি কি তবে আমার ভাই? আমি ত কখন ভাই দেখি-নি।"

লোকনাথ বলিল—"আমি বুঝেছি, আমাদের দুঃখের কথা শুনে আপনার দয়া হয়েছে। কিন্তু দেখুন—আমরা দুঃখী বটে, কিন্তু এখনও খেটে খেতে পারি। আমায় ক্ষমা করুন—আপনার এ দান আমি নেব না। এমন অনেক অন্ধ আতুর দুঃখী আছে, যারা খেটে খেতে পারে না, আপনি এ টাকা তাদের দেবেন, আপনার দান সার্থক হবে।"

সোমনাথ একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"না মহাশয়, আপনি সেরূপ ভাব্‌বেন না। আমি এ টাকা আপনাকেত দিই নাই, এ টাকা আপনার কন্যাকেই দিয়েছি।"

লোক। আজ্ঞে, কন্যাকে দিলেই আমাকে দেওয়া হলো।

সোম। না হয়—আপনি ও টাকা নাই খরচ কর্‌বেন।

লোক। তবে ও টাকায় আর কি করবো ?

সোম। আপনার অমন সুন্দর মেয়ে, কিন্তু গায়ে একখানিও গহনা নাই, আপনি না হয়, একখানা গহনা গড়িয়ে আপনার মেয়েকে দেবেন।

লোক। আজ্ঞে, গহনা পরেত আর কোন লাভ দেখতে পাইনে, কেবল চোরের দৌরাত্ম্য বাড়ান হবে। এখন নির্ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পারি, তখন আর রাত্রে ঘুম হবে না।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ঘোষজা মহাশয়, যখন ইনি লীলাকে ও টাকা দিয়েছেন, তখন আপনার নেওয়ায় কোন হানি নাই। মনে করুন, এখন যেন চোরের ভয়ে লীলাকে গহনা দিলেন না, কিন্তু লীলার বিবাহের সময় তাকে গহনা না দিলেত ভাল পাত্র মিল্‌বে না, তখন কি কর্‌বেন ?"

"লীলার বিবাহ—লীলার বিবাহ।"—দুই তিনবার এই কথা কয়েকটি বলিয়া লোকনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তার পর নরেন্দ্রনাথকে বলিল—"তবে আপনি ও টাকা এখন রেখে দিন, লীলার বিবাহের সময় আমাকে ও টাকা দেবেন। এখন আপনার কাছে জমা থাক্।"

অগত্যা নরেন্দ্রনাথ তাহাই স্বীকার করিলেন। তার পর লোকনাথ সোমনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে লীলাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে চলিয়া গেল। গৃহ হইতে বাহির হইয়াই লীলা সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল। কিন্তু সোমনাথ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকারের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। এবারেও নরেন্দ্রনাথ সোমনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার গণ্ডস্থলে সেইরূপ অশ্রুধারা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর আরো চারি বৎসর গত হইয়াছে। এখন লীলার বয়স দ্বাদশ বৎসর। এই বয়সেই প্রস্ফুটিত-উন্মুখ গোলাপকলিকাসদৃশ লীলার সে রূপের শোভা অঙ্গে যেন আর ধরে না। দেখিলেই মনে হয়—এ কলিকা ফুটিলে যে সৌন্দর্য্য বাড়িবে—সে সৌন্দর্য্য বুঝি আর—এ অঙ্গে ধরিবে না। শৈশবের সে সৌন্দর্য্যের সহিত কৈশোরের এ সৌন্দর্য্যের যেন তুলনা হয় না। বোধ হয়—শৈশবের সৌন্দর্য্যের মধ্যে কৈশোরের সৌন্দর্য্যরাশি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল, তাহা না হইলে হঠাৎ এ সৌন্দর্য্যরাশি কোথা হইতে আসিল ? বালিকার উভয় সৌন্দর্য্যই অতি সুন্দর ও অতি মনোহর। কিন্তু এ কথা যেন স্মরণ থাকে, লীলার যৌবনের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশির এখন আভাস মাত্র পাওয়া যাইতেছে!

কিন্তু এই আভাসেই আমরা কতকটা বুঝিয়াছি। প্রভাতে যে বালসূর্য্যের এত তেজ, না জানি মধ্যাহ্নে সে তেজ যে কত বাড়িবে; সে কথা অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না। বর্ষার প্রারম্ভেই যে কল্লোলিনীর বেগ, পূর্ণবর্ষায় তাহার সে বেগের অনুভূতি সহজেই হইতে পারে। তবে যখন এ সৌন্দর্য্যের এখনও কেহ আদর করিল না, তখন সে কথা লইয়া এখন আর বাড়াবাড়ি করিব না। আজ কাল কায়স্থের কন্যার বিবাহ বড় সহজ কথা নহে। কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও রূপবতী হইলেও কন্যাকর্ত্তা অর্থাভাবে মনোমত পাত্রে সে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। লীলা রূপবতী হইলে কি হইবে ? লীলার পিতা অতি

দরিদ্র বলিয়া কেহই সে রূপের আদর করিল না। লোকনাথ ক্রমে উদ্বিগ্ন হইলেন। বুঝি বা তাঁহার জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করা ভার হয়। কায়স্থের ঘরে এমন অনেক কালাচাঁদ বা নদেরচাঁদ ছিল, যাহারা লীলাকে বিবাহ করিয়া লোকনাথকে অনুগৃহীত করিতে পারিত, কিন্তু সে সকল পাত্রে বিবাহ দিতে লোকনাথ স্বীকৃত নহে। এ দিকে লীলাকেও এরূপ অবস্থায় আর রাখা যায় না। সুতরাং লোকনাথ বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। রাত্রে তাহার আর নিদ্রা হয় না, আহারে তাহার আর প্রবৃত্তি নাই, গৃহকর্ম্মেও এখন আর তাহার কোন উৎসাহ নাই। কোন গুরুতর অপরাধ করিলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, এখন তাহার মনের অবস্থা সেইরূপ। যে স্নেহের কন্যাকে দেখিলে লোকনাথ আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাইত, এখন সেই স্নেহের কন্যাও যেন তাহার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লীলাকে দেখিলেই এখন তাহার প্রাণে একটা আতঙ্কের উদয় হইত। আবার পর মুহূর্ত্তেই কোথা হইতে যেন একটা প্রজ্বলিত হুতাশন তাহার হৃদয়মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত। লোকনাথ কাজেই অস্থির হইয়া পড়িত।

এতকালের পর, বিন্দুবাসিনীরও সেই চিরপ্রফুল্ল মুখকমল এখন মলিন হইয়া গিয়াছে। সেই সততহাস্যময় মুখকমলে এখন আর সে হাসির শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকনাথের অন্ধকারময় হৃদয় এখন আর সে হাসির আলোকে আলোকিত হয় না। তাহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম লীলার আজও বিবাহ হইল না। এই দুর্ভাবনায় সে হাসির বিকাশ এখন একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিন্দুবাসিনীর আর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ। যে বিন্দু গৃহকর্ম্মছাড়া তিলার্দ্ধ থাকিতে পারিত না, এখন সে গৃহকর্ম্মেও আর তাহার মন নাই। তবে না রাঁধিলে চলিবে না—তাই রাঁধিতে হয়, না খাইলে চলে না—তাই খাইতেও হয়। প্রথম প্রথম লীলার বিবাহের কথা উত্থাপন হইলে বিন্দুবাসিনীর আনন্দের সীমা থাকিত না, বিন্দু দিবাভাগে মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিত, রাত্রে কত সুখস্বপ্নই দেখিত। বিন্দুবাসিনীর বড় সাধ, তিনি কন্যার বিবাহ দিয়া একটির পরিবর্ত্তে দুইটি পাইবেন—জামাতাতেই পুত্রের সাধ মিটাইবেন। এখন মনোমত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া সেই সুখকল্পনা ও সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিন্দু এই ঘটনায় প্রাণে যে আঘাত পাইয়াছে, এরূপ আঘাত সে জীবনে কখন পায় নাই।

লীলা এখন আর সেই ক্ষুদ্র বালিকা নয়—লীলার এখন জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু এখনও লীলা তাহার জনকজননীর বিষাদের কারণ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সে ক্ষুদ্র বালিকা সমাজতত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে? অনেক সময় লীলা ভাবিত—বালিকা বড় হয় কি কেবল পিতামাতাকে অসুখী করিবার জন্য? লীলা আর কি করিবে? কেবল গৃহকর্ম্মে মনোযোগ দিয়া পিতামাতাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে লীলা বিনা অপরাধে পিতামাতার নিকট গুরুতর অপরাধী হইয়াছে, কিন্তু কি অপরাধ যে সে করিয়াছে—লীলা তাহা বুঝিতে পারিত না।

এই ক্ষুদ্র পরিবারের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন একদিন বৈকালে বিন্দুবাসিনী চিন্তাকুল লোকনাথকে বলিল—"তোমার কি মনে হয় না—ও পাড়ার মেজঠাকরুণের ছেলে নরেনের কে বন্ধু না

কি আমার লীলার বিয়ের জন্য সাড়ে বার গণ্ডা টাকা নরেনের কাছে রেখে গিয়েছে ?"

লোকনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"সে টাকায় কি হবে ? পঞ্চাশ টাকায় কি এখন মেয়ের বিয়ে হয় ?"

বিন্দু। কত টাকা হলে হয় ?

লোক। যে বাজার পড়েছে, তাতে অন্তত পাঁচ-শ টাকার কম, কোন মতেই এ দায় থেকে উদ্ধার হতে পারবো না।

বিন্দু। পাঁচ-শ টাকা—পাঁচ-শ টাকা—তাতে কত গণ্ডা হয় ?

বিন্দুবাসিনীর কথা শুনিয়া এত দুঃখেতেও লোকনাথের মুখে হাসি দেখা দিল। ঈষৎ হাসিয়া লোকনাথ বলিল—"সে অনেক টাকা। আমাদের বাড়ীঘর জমী-জমা বেচিলেও তত টাকা হয় না।"

বিন্দু। তবে উপায় ?

পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লোকনাথ বলিল—"উপায় থাক্‌লে কি আর এত দিন নিশ্চিন্ত থাকি ?"

বিন্দু। যে লোক না চাইতেই আপনি জোর করে সাড়ে বার গণ্ডা টাকা লীলার বিয়ের জন্য রেঁখে গেছেন, তাঁর কাছে মুখ ফুটে চাইলে কি তিনি আরো কিছু বেশী দেবেন না ?

লোকনাথ বসিয়াছিল, বিন্দুবাসিনীর শেষ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিল। বিন্দু তাহাতে যেন কিছু ভীত হইয়া স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল। লোকনাথ অমনি বলিয়া উঠিল—"বিন্দু—বিন্দু—এতদিন পরে বুঝি অকূল সাগরের কূল পাইলাম। অনেক কষ্ট পেয়েছি—কিন্তু এ পর্য্যন্ত এখনও কারো কাছে ভিক্ষা করি নাই, শেষ লীলাকে সৎপাত্রে বিয়ে দিয়ে সুখী করবার জন্যে একবার ভিক্ষা করেও দেখ্‌বো—মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম। কিন্তু কার কাছে ভিক্ষা করতে যাই, তা এতদিন স্থির করতে পারি নাই। আজ তোমার কথায় সেই দাতার কথা মনে হয়ে গেল। বোধ হয়, তাঁর কাছে ভিক্ষা করলে আমি এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারবো। আমি একবার নরেনের কাছ থেকে সেই বাবুটির সন্ধান নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া লোকনাথ তাড়াতাড়ি নরেন্দ্রনাথের বাড়ী চলিল। নরেন্দ্র তখন বৈঠকখানায় একাকী ছিলেন। লোকনাথ আপনার অবস্থার বিষয় বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আপনার সেই বন্ধু ভিন্ন এ দায় থেকে উদ্ধার হবার আমার আর অন্য উপায় নাই। আপনাকে এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে।"

নরেন্দ্রনাথ লোকনাথকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"আপনি এত দিন আমায় এ কথা বলেন নাই কেন ? সোমনাথ আপনার লীলাকে যেরূপ স্নেহ করে, তাতে সে যে আপনাকে এ দায় থেকে উদ্ধার করে দেবে, এই বিষয়ে আমার বিশেষ ভরসা আছে। তিনি প্রতি পত্রেই লীলা কেমন আছে—সে কত বড় হয়েছে—তার বিয়ে হয়েছে কি না—এই কথা লিখে থাকেন। এখন তিনি লক্ষ্ণৌতেই আছেন, আমি আজ তাঁকে এ বিষয়ের জন্য পত্র লিখবো। আর সোমনাথ আপনার লীলার গহনার জন্যে যে ৫০৲ টাকার নোট দিয়েছিলেন, সে নোটখানি এখনও আমার নিকটে রয়েছে। ইচ্ছা করলে আপনি এখনই সে নোটখানি নিতে পারেন।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া লোকনাথের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আনন্দাশ্রু এইবার তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে

আরম্ভ করিল। লোকনাথ আনন্দবিহ্বল-স্বরে বলিল—"তবে কি আমি এ দায় থেকে উদ্ধার হতে পার্‌বো—আমার লীলাকে কি আমি সুখী করিতে পার্‌বো? সে বাবুটি আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়। আমার লীলার প্রতি কি তাঁর এত দয়া হবে?"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ঘোষজা মহাশয়, আপনার ন্যায় ভাল মানুষ লোক এ গ্রামে আর দুটি নাই। আপনার কোন উপকার কর্‌বার জন্যে আমি প্রাণ-পণে চেষ্টা কর্‌বো। লীলার বিবাহের ভার আমার, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন গে।"

লোকনাথ যেন স্বর্গ হাতে বাড়াইয়া পাইল, কিন্তু সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। এ সংবাদ বিন্দু-বাসিনীকে দিবার জন্যে দৌড়িয়া গৃহে আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"ঘোষজা মহাশয় বাড়ী আছেন—ঘোষজা মহাশয়?"

একদিন প্রাতঃকালে নরেন্দ্রনাথ লোকনাথের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছিলেন—"ঘোষজা মহাশয় বাড়ী আছেন—ঘোষজা মহাশয়?"

নরেন্দ্রনাথ একাকী নহেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত সোম-নাথও ছিলেন। লোকনাথ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উভয়কে দেখিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ যেন হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তার পর পরমাহ্লাদে বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে অভ্যর্থনা করিল। তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর আনিয়া উভয়কে দাওয়াতে বসিতে দিল। সোমনাথ তাহাকে এরূপ ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত সেই মাতুরে উপবেশন করিলেন। এবার নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"তোমার লীলার অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন. সোমনাথ আমার পত্র পেয়ে সে পত্রের উত্তরে পত্র না লিখে, নিজেই বলতে এসেছেন যে তিনি তোমার লীলার বিবাহের সমস্ত খরচ দিবেন, তোমাকে তার জন্যে কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া লোকনাথ একবারে কাঁদিয়া ফেলিল। কিরূপে সোমনাথ বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ ও সোমনাথ হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, বিন্দুবাসিনী নরেন্দ্র-নাথের সহিত একজন অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া প্রথমে তাড়াতাড়ি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া একবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল, সুতরাং আর গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিল না। তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিল—"কে বাবা তুমি?—আমার লীলার উপর তোমার এত দয়া—কে বাবা তুমি?"

সোমনাথ দেখিলেন—গৃহিণীরও চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে! সোম-নাথ সে দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; এইবার তাঁহারও চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল, তিনিও কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"মা, আমি তোমার ছেলে।"

এই সময় কতকগুলি মাজা বাসন লইয়া অতি ধীরে ধীরে লীলা প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিল। দুই জন আগন্তুককে দেখিয়া লজ্জায় একটু জড়সড় হইল। তাহা দেখিয়া বিন্দুবাসিনী বলিল—"লজ্জা কি

বা, অপর কেউ নয়, এরা তোমারই ভাই।”

লীলা আর লজ্জা করিল না। নত-শিরে ধীরে ধীরে মাজা বাসনগুলি রাখিতে গৃহের মধ্যে গেল। ঘরের মেজের উপর বাসনগুলি রাখিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া আসিল। দাওয়া দিয়া চলিয়া আসিবার সময় গোপনে ঈষৎ বক্রনয়নে সোমনাথের প্রতি লীলা এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু লীলার সে দৃষ্টি গোপন রহিল না; অন্য কেহ জানিতে না পারিলেও সোমনাথ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, সেই সময় তিনিও সেইরূপ গোপনে লীলাকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উভয়েরই সেই বক্রদৃষ্টি এক সমসূত্রে মিলিল, সুতরাং উভয়ে কেবল উভয়ের নিকট ধরা পড়িল। সোমনাথের হৃদয় কি জানি কেন—এই সময় একবার কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মস্তক যেন ঘুরিয়া গেল। অনেক চেষ্টার পর তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। লীলা কিন্তু ধরা পড়িয়া সলজ্জভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া উঠান-ঝাট দিতে আরম্ভ করিল। আর একবারও সোম-নাথকে দেখিতে চেষ্টা করিল না। লীলা সেই ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতেই সোমনাথকে চিনিতে পারিয়াছিল, কারণ সে রূপ একবার দেখিলে কেহ কখন ভুলিতে পারে না।

লীলা লজ্জাপ্রযুক্ত সোমনাথের দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না বটে, কিন্তু ইহাতে সোমনাথের বড়ই সুবিধা হইল, সকলের অজ্ঞাতে বরাবর লীলাকে দেখিতে লাগি-লেন। কিন্তু সে রূপ যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শনপিপাসা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইল না। এই সময় নরেন্দ্র-নাথ লীলার বিবাহে কিরূপ ব্যয় হইবে, কিরূপ পাত্র হইলে হয়, লোকনাথ ও বিন্দুবাসিনীর সহিত এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন। সোমনাথ বাহ্যিক আকারে যেন একমনে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক সে সময়ে একটি কথাও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন —লীলার ঐ সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে এত আরক্তিম হইল কেন? লজ্জা —না গুরুতর পরিশ্রমে? তিনি এখন কেবল ইহারই মীমাংসায় ব্যস্ত। এই সময় নরেন্দ্রনাথের কথা শেষ হইলে নরেন্দ্রনাথ সোমনাথকে বলিলেন,—“তবে এখন চল যাই, যেরূপ কথাবার্ত্তা হ'ল সেইরূপই কাজ করা যাবে।”

কথাবার্ত্তা যে কি হইল—তাহা ত সোমনাথ জানেন না, কিন্তু এখন এ স্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইবারও বুঝি তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, কারণ এই সময় আবর্জ্জ-নাদি ফেলিতে লীলা বাহিরে গিয়াছিল; সুতরাং গৃহে যাইবার সময় একবার সেই আরক্তিম সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি না দেখিয়া কি সোমনাথ যাইতে পারেন? কিছুক্ষণ আরো অপেক্ষা করিবার জন্যে সোমনাথ বলিলেন—“তবে বিবাহ কি এই মাসেই হবে?”

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—“সে কথা ত এইমাত্র হয়ে গেল—পাত্র স্থির হলেই হবে।”

লোকনাথ বলিল—“বাবা আজ যদি পাত্র স্থির হয়, আমি কাল বিয়ে দেবো, এ মেয়ে কি আর আমি ঘরে রাখতে পারি?”

বিন্দুবাসিনী বলিল—“বাবা, তুমি রাজা হও, তোমার সোণার দোয়াত কলম হক, আর আমার মাথার যত চুল, তোমার তত পেরমাই হক।”

বিন্ধ্যবাসিনীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সোমনাথ নতশিরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এই সময় লীলা বাহির হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন সোমনাথ লীলাকে দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথের সহিত লোকনাথের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে চলিলেন। নরেন্দ্রনাথ কি ভাবিতেছিলেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সোমনাথ যে লীলার সেই আরক্তিম মুখের সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। নরেন্দ্রনাথ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে হঠাৎ তাঁহার সোমনাথের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তিনি তাঁহাকে কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বলিলেন—"ভাই সোমনাথ, তুমি কি ভাব্‌ছ?"

সোমনাথ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"আমি সমাজের অত্যাচারের কথা ভাব্‌ছি।"

নরে। কি অত্যাচার ভাই?

সোম। দরিদ্রের কন্যা পরমাসুন্দরী হলেও এ সমাজে তার পাত্র মেলে না! যার অর্থ দেবার কোন সামর্থ্য নাই, তার কি কন্যার বিবাহ হবে না? এর চেয়ে বেশী অত্যাচার আর কি হতে পারে?

নরে। এখন ক্রমে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতে উপযুক্ত খরচ পত্র না করলে কন্যার বিবাহ হওয়া দায়। আমাদের এই গ্রামেই নবীনবোসের এক পুত্র আছে, সে ছেলে দেখ্‌তে অতি কদাকার, কিন্তু গুণের মধ্যে ছেলেটি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই ছেলের সঙ্গেই লোকনাথ তার কন্যার বিবাহের জন্যে চেষ্টা কর্‌তে আমায় বিশেষ অনুরোধ করেছে, কিন্তু আমি বেশ বল্‌ছি—দুটি হাজার টাকার কম নবীন বাবু কোন মতে রাজী হবেন না। এই যে নবীন বাবু এই দিকে আস্‌ছেন, একটু অপেক্ষা কর না, একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।

এই সময় গ্রামের নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবীনবাবু, আপনার পুত্রের জন্য আমি একটি সম্বন্ধ স্থির করেছি, সে বিষয়ে আপনার কি মত বলুন।"

নবীনচন্দ্র একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ছেলেটি আমার সবে এণ্ট্রান্স পাস করেছে, এ সময় বিবাহ দিলে ২।৩ হাজারের বেশীত আর পাব না, এল—এ পাশটা করলে কিছু বেশী রকম পাওয়া যেতে পারে, তাই আমার ইচ্ছে—"

নরে। তবে কি আপনি এখন পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নন?

নবীন। আমি ইচ্ছুক নই বটে, কিন্তু গৃহিণীর একটি পুত্রবধূর বড়ই সাধ। তাই মনে করেছি—প্রথম ছেলেটি আর অধিক দিন ধরে না রেখে, এই সময়ই বিবাহটা দিয়ে ফেলি। তা সম্বন্ধটা কোথায়—কি রকম পাওনা টাওনা হবে বল দেখি?

নরে। পাওনা বেশী আর কোথা থেকে হবে? আমি আমাদের গ্রামের লোকনাথ ঘোষের কন্যার সঙ্গে যে সম্বন্ধ কর্‌ছি।

নবীন চন্দ্র নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"তবে তুমি ঠাট্টা কর্‌ছো বলো।"

নরে। কেন—ঠাট্টা কিসে হলো? লোকনাথ আপনাদের স্বজাতি ও স্বঘর। আর কন্যাটিও পরমাসুন্দরী, তবে ঠাট্টা কিসে হলো?

নবী। স্বজাতি, স্বঘর আর মেয়ে সুন্দরী হলেই কি আজ কাল বিবাহ হয়? বর্দ্ধমানের মুন্সেফ দুইহাজার টাকা দিতে চেয়ে ছিলো, তারই মেয়ের সঙ্গে যার আমি উপেনের বিবাহের মত করি-নি।

নরে। আচ্ছা, যদি লোকনাথ দুহাজার টাকা দেয়, তবে আপনি রাজী আছেন?

নবী। কোথায় পাবে তা দেবে? যে খেতে পায় না, সে আবার দুহাজার টাকা মেয়ের বিবাহে খরচ কর্‌বে—এ কথা বিশ্বাস হবে কেন?

নরে। দেখুন, লোকনাথ গরীব বলে, কোন ভদ্রলোক তার কন্যার বিবাহের সমস্ত ব্যয় দিবেন। তিনি দুহাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করতে পারেন, আর লোকনাথেরও একান্ত ইচ্ছা যে আপনারই পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ হয়। এতে আপনি রাজী আছেন কি?।

নবী। আমার ছেলের মতন ছেলে আর পাবে কোথায়? কিন্তু আমি তোমার এ সম্বন্ধে রাজী হতে পারি না। এখন যেন একজন ভদ্রলোক দয়া করে সমস্ত খরচ দিচ্ছেন, কিন্তু এ যে আমার মূলোর ক্ষেত হবে।

নরে। মূলোর ক্ষেত কি রকম?

নবী। বিবাহের সময় যা কিছু পেলাম ঐ পর্য্যন্ত, তার পর আর কুটুম্বিতের সুখ হবে না।

নরে। কুটুম্বিতের সুখ হবে না কেন? লোকনাথ গরীব হক—কিন্তু লোক সজ্জন নয় কি?

নবী। সজ্জন হলে কি হবে? হিন্দুর ঘরে বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, সে সকল পার্ব্বণে রীতিমত তত্ত্ব করতে পার্ব্বে কেন?

নরে। আত্মীয়তা রক্ষা করবার জন্যে যেরূপ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক, তা তিনি বেশ পারবেন, তবে প্রতি পার্ব্বণে বড় বড় হাঁড়ি করে মিষ্টান্ন পাঠাতে পারবেন না বটে।

নবী। তবেইত—তবেইত—কুটুম্বিতের সুখ আর কি করে হবে? তার হাঁড়ির খবর আমি ত জানি।

নরে। তবে আপনি রাজী নন?

নবীনচন্দ্র ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে অসম্মতিসূচক উত্তর দিয়া তাড়াতাড়ি গন্তব্য পথে চলিলেন। সোমনাথ এতক্ষণ নীরবে উভয়ের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, এইবার নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই নবীন বাবুর সম্পত্তি কি আছে?"

নরে। সম্পত্তির মধ্যে চাকরি আর বাস্তু ভিটে।

সোম। কি চাক্‌রী করেন?

নরে। কলিকাতায় কোন স্কুলে ৩০৲ ত্রিশ টাকা বেতনের মাষ্টারী আর মধ্যে মধ্যে সভা করে পুত্রের বিবাহে অর্থগ্রহণের বিপক্ষে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

সোম। এরাই আবার আমাদের সমাজ-সংস্কারক!

নরে। কেবল পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধে নয়—এঁদের সমাজ সংস্কার কি রকম জান—অবলা হিন্দু বিধবার বিবাহ দেওয়া—স্ত্রীপুরুষকে সমান অধিকার দেওয়া, আবার ইংরেজ তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়ার সাধও এঁদের আছে। সকল অনুষ্ঠানই কেবল মুখে, কাজে কিছুই নাই। কল্‌কেতায় বসুজার বক্তৃতা শুনলে বসুজাকে ব্রাহ্ম বলে মনে হবে, বাপের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মও সাজেন, কিন্তু ছেলের বিবাহের কথা উত্থাপন করলে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু হয়ে দাঁড়ান। সে যা হক,

লোকনাথের কন্যার বিবাহের পাত্র স্থির করা প্রথমে যত সহজ মনে করেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি এ কাজ তত সহজ নয়। আমি দেখ্‌ছি—পিতা গরীব হলে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করলেও যে সুপাত্র মেলে না! লীলার কি তবে পাত্র মিল্‌বে না?

নরেন্দ্রনাথের শেষ কথা শুনিয়া সোমনাথ চমকিয়া উঠিলেন। হঠাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেরূপ চমকিয়া উঠে, সোমনাথ সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। তার পর উত্তেজিতভাবে ও উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"লীলার পাত্র মিল্‌বে না! এ পৃথিবীতে এমন কি কেউ নাই যে লীলাকে পেলে আপনার জীবন সার্থক মনে করে—অসম্ভব! এত সৌন্দর্য্য ও গুণের আদর হবে না—অসম্ভব—অসম্ভব!"

নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ সোমনাথের এরূপ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া প্রথমে থতমত খাইয়া গেলেন। তার পর বলিলেন—"কই এমন লোক কোথায়?"

সোমনাথ সেইরূপ উত্তেজিতভাবে ও গম্ভীরস্বরে তখন বলিলেন—"আমি!"

নরেন্দ্রনাথ অবাক্! এরূপ অসম্ভব কি সম্ভব হইতে পারে? প্রথমে আপনার কর্ণকেও অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন—"কে?"

পুনরায় উত্তর আসিল—"আমি।"

আবার সেই আমি! নরেন্দ্রনাথ আবার অবাক্! এবার কাহাকে অবিশ্বাস করিবেন? নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সোমনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এ কথা কি সত্য না উপহাস?"

সোমনাথ সংযতভাবে উত্তর করিলেন—"রাস্তায় এ সকল কথা হতে পারে না—ঘরে চল। তোমার সকল কথা খুলে বল্‌বো।"

নরেন্দ্রনাথ আর একটিও কথা কহিলেন না, উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য বিশেষের চরিত্র নিজে মনে মনে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু নিজে বুঝিলেও অপরকে সঠিক বুঝান তত সহজ নহে। সোমনাথের চরিত্র আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু অপরকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ। সকলেই বুঝিয়াছেন যে সোমনাথ সচ্চরিত্র, দয়ালু, বিদ্বান ও অন্যান্য অনেক গুণে ভূষিত। কিন্তু ইহা ব্যতীত এই চরিত্রে যে আরো একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন বলিয়া এখনও আমাদের ভরসা হয় না। যতক্ষণ সে বিশেষত্বটুকু বুঝাইতে না পারিব, ততক্ষণ আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

সোমনাথ প্রথমে আমাদের লীলাকে সেই জলঝড়ের মধ্যে যে অবস্থায় দেখেন, সে অবস্থায় তাঁহার মনে যে লীলার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সেই সময় তিনি লীলার রূপ দেখিয়াও বিস্মিত হন। তার পর তাহার অসাধারণ গুণের পরিচয়ে একেবারে মোহিত হইয়া যান। এত দরিদ্র তবুও দান গ্রহণ করে না, এত দরিদ্র তবুও বিক্রয় করিতে গিয়া খরিদদারের যাচিত মূল্য অধিক বোধে প্রত্যর্পণ করে! এই ক্ষুদ্র বালিকার এ সকল গুণ কি অসাধারণ নয়? সোমনাথের ন্যায় হৃদয়বান্ ব্যক্তির সহানুভূতি কি ইহাতে শীঘ্রই আকর্ষিত হইতে পারে না? এই এক ঘটনাতেই লীলার প্রতি সোমনাথের বিশেষ সহানুভূতি জন্মিল। সেই দিনকার এই ঘটনাতেই এই ক্ষুদ্র

বালিকা সোমনাথের হৃদয়ে একবারে অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই চারি বৎসরের মধ্যে আর একবারও লীলাকে না দেখিলেও সোমনাথ সেই হইতে লীলাকে আর ভুলিতে পারিলেন না। তিনি অনেক সময় লীলার বিষয় ভাবিতেন। নরেন্দ্র-নাথের পত্রে অবশ্য সোমনাথের নিকট মাত্র অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা ছিল, কিন্তু গত চারি বৎসরে সেই ক্ষুদ্র লীলা সোমনাথের মনের এতদূর পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, সোমনাথ নরেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া স্বয়ং বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন। আবার বেড়াইতে যাইবার ছল করিয়া নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বয়ংই লোকনাথের গৃহে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। লোকনাথকে ডাকিয়া না পাঠাইয়া কেন যে সোমনাথ স্বয়ং তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নরেন্দ্র সে সময় সঙ্গে থাকিয়াও সে কথা বুঝিতে পারেন নাই!

তার পর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে সোমনাথ নবীন বন্ধুর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়া এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সেই হৃদয়-পোষিত মনের ভাব বন্ধুর নিকট হঠাৎ তিনি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন! কেবল এই আকস্মিক উত্তেজনার ফলেই তিনি মুখের একটা বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। সে গৃহে কাহাকেও আসিতে নিষেধ করিয়া সোম-নাথ দরজা অর্গলাবদ্ধ করিলেন। হৃদয়ের কপাট খুলিবেন কি না, সেই কারণ ঘরের কপাট দৃঢ়রূপে বন্ধ করা হইল। সোম-নাথকে প্রথমে কোন কথাই বলিতে হইল না, নরেন্দ্রনাথই প্রথমেই আরম্ভ করিলেন —"সোমনাথ, যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তুমি মানুষ নও—তুমি দেবতা।"

সোমনাথ ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন —"তুমি দেবতার অবমাননা কর কেন?"

নরে। যে পথের ভিখারিণীকে রাজ-রাণী কর্‌তে পারে, তাকে দেবতা বল্‌বো না ত কি বল্‌বো?

সোম। ও কথা এখন থাক্। দেখ নরেন, আমার পিতা মাতা কেউ নাই। বিবাহ সম্বন্ধে আর কারো অনুমতি চাই না, কিন্তু চাই কেবল তোমার। তুমি এ বিবাহ অনুমোদন কর কি না?

নরে। আমি ত তোমায় বলেছি, তুমি এ বিবাহ কর্‌লে তোমায় আর মানুষ ভাব্‌বো না, দেবতা বলে ভক্তি কর্‌বো। এতে সমাজকেও বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হবে, আর এ কথা যে শুন্‌বে, সেই তোমায় দেবতার ন্যায় ভক্তি কর্‌বে।

সোম। তোমার এখানে দুই তিনবার এসেছি, কিন্তু এখানকার কেউ যখন আমার প্রকৃত পরিচয় জানে না, তখন এখানে আর কোন পরিচয় দেবার আবশ্যক করে না। তবে আমি যে জাতিতে কায়স্থ, এ কথা ঘোষজা মহাশয়কে তুমি বলো; আর আমার কুলশীলের পক্ষে যাতে তাঁর মনে কোন সন্দেহ না হয়, তার জন্যে তুমি জামীন হও।

নরে। আচ্ছা বেশ কথা। তোমার পরিচয় দিলে হয়ত এখন হঠাৎ কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না।

এইবার সোমনাথের মন প্রফুল্ল হইল। একখানা কালমেঘ অনেকক্ষণ পূর্ণিমার চন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়া হঠাৎ বায়ুভরে সরিয়া গেলে, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, সোমনাথের মুখচন্দ্রও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। সোমনাথ তখন

হাস্যমুখে কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আবার একটু লজ্জিতভাবে যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ এতদিন যেন অন্ধ ছিলেন, এইবার কিন্তু তাঁহার চক্ষু ফুটিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এখনি কি আমায় লোকনাথের বাড়ী দৌড়িয়ে যেতে হবে না কি? না তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?"

সোম। নাহে না, সে কথা নয়।

নরে। তবে আর কি কথা? আমি বেশ বুঝ্‌ছি যে লীলা ছাড়া এখন তোমার আর কোন কথাই নাই। লীলার সম্বন্ধে তোমার লীলাখেলা এখন আমি বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি যাচ্ছা আমার চক্ষে ধূলো দিয়েছিলে! পূর্ব্বে আমার মনে একটুও সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় নাই।

সোমনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"লীলার কথাই বটে, কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তা নয়। আমি বলছিলাম কি—লীলার সঙ্গে কি আমার একবার গোপনে দেখা হতে পারে না?"

নরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তবে কি এখন কোর্টসিপের বন্দোবস্ত করতে যাবো না কি?"

সোমনাথ উত্তর করিলেন—"না ভাই, অপরাধ হয়েছে, তোমার কোন বন্দোবস্তই আর করতে হবে না।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তথাপি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সোমনাথ তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাও?"

নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আবার কোথায়? তোমার লীলার কাছে।"

সোম। এখনি—এত তাড়াতাড়ি যাবার কি দরকার?

নরে। এত বড় একটা শুভসংবাদ—তাদের না জানিয়ে কি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক্‌তে পারি?

এই কথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ততার সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সোমনাথ অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে লোকনাথ অতি দরিদ্র, তাহার কন্যার যদি সুপাত্রে বিবাহ হয়, তবে যে হিন্দুধর্ম্মই মিথ্যা হইয়া যাইবে! সোমনাথকে গ্রামের অনেকেই দেখিয়াছিলেন। গ্রামের অনেকেই জানিতেন—নরেন্দ্রনাথের বন্ধু সোমনাথ দেখিতে অতি সুশ্রী, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, সঙ্গতিপন্ন। সুতরাং এরূপ পাত্রের সহিত দরিদ্র লোকনাথের কন্যার বিবাহ—এ কথা শুনিয়া কি আর তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দলের মধ্যেই, এই বিবাহের একটা তুমুল আন্দোলন উঠিল। সোমনাথ অজ্ঞাতকুলশীল, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া লোকনাথের উচিত নয়। হউক না সুশ্রী, হউক না সচ্চরিত্র, হউক না বিদ্বান, হউক না ধনী, আপনার জাতিরক্ষা ত চাই। ক্রমে লোকনাথ ও বিন্দুবাসিনী সে সকল কথা শুনিল। তখন তাহাদের আনন্দসাগরে পুনরায় বিষাদের তরঙ্গ উঠিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বিন্দুবাসিনী লোকনাথকে বলিল—"তুমি অত ভাব কেন? যার এমন স্বভাব—এত দয়া—সে কি কখন লোকের জাত নষ্ট কর্‌তে পারে? দেখ্‌ছ না—আমাদের ভাল কেউ দেখ্‌তে পারে না বলেই, হিংসে করে নানান লোকে নানান কথা তুল্‌ছে।"

লোকনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"তাত জানি, কিন্তু সোমনাথকেও তার পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সোমনাথও কোন পরিচয় দেন না। সে কথা জিজ্ঞেস্ করলেই যেন বিরক্ত হন, অমনি কথাটা চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়েন।"

বিন্দু। সে যে কায়স্থ সে পরিচয় ত দিয়েছে। তার পর আজ কালের ছেলে আবার পরিচয় কি দিবে? আহা ছেলে মানুষ! অভিভাবক কেউ নাই। আপনি দেখে শুনে বিয়ে করছে—এত পরিচয় দিয়ে বিয়ে করতে লজ্জা করে—বোধ হয়।

লীলা সেইখানে বসিয়া লক্ষ্মীপূজার ধান বাচিতেছিল, লোকনাথ এইবার আমোদ করিয়া লীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা তোমার কি মত?"

লীলা লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। লোকনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"দেখ বিন্দু, সোমনাথ ছেলে ভাল বটে, কিন্তু যখন এত কথা উঠ্ছে, তখন সোমনাথকে মেয়ে না দেওয়াই ভাল। কোন দোষই যদি না থাক্‌বে, তবে এমন ভাল ছেলের এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে হয় নাই কেন?"

বিন্দুবাসিনী উত্তর করিল—"আজ কালের ছেলেরা কি অল্প বয়সে বিয়ে করে?"

লোকনাথ পুনরায় চিন্তা করিয়া বলিল—"না, আমি এ বিবাহ দেব না।"

এই সময় বিন্দুবাসিনী একবার লীলার প্রতি চাহিয়া দেখিল। লীলা তখনও হেঁট হইয়া ধান বাচিতেছিল, আর বিশেষ আগ্রহের সহিত কাণ পাতিয়া পিতামাতার মত কথাই শুনিতেছিল। বিন্দুবাসিনী এই বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল—কোথা হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িয়া লীলার লক্ষ্মীপূজার বাচা ধানগুলি ভিজিতেছে! তৎক্ষণাৎ বিন্দুবাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ জল আর কোথা হইতে আসিবে—এ জল লীলারই চক্ষের জল! তবে কি লীলা কাঁদিতেছে! পিতা, সোমনাথের সহিত বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া কি লীলা কাঁদিতেছে! মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কথা বিন্দুবাসিনীর মনে জাগিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী লোকনাথকে ডাকিয়া বলিল—"দেখ—তোমার মায়ের মত—ঐ চক্ষের জলেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

জননীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লীলা সেখান হইতে দৌড়িয়া গিয়া একবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। লীলার স্বভাবের এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া লোকনাথ একবারে যেন হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।

লীলার এ পরিবর্ত্তনে কিন্তু বিন্দুবাসিনী এতদূর বিস্মিত হয় নাই। বিন্দুবাসিনীও এক সময়ে বালিকা ছিল, সুতরাং বিন্দুবাসিনী এখন প্রৌঢ়াবস্থায় এ সম্বন্ধে অনেক বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে। আর বিন্দু স্ত্রীলোক, সে লীলার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র বুঝিতে পারিবে, লোকনাথের পক্ষে তত শীঘ্র বুঝিতে পারা অসম্ভব।

লীলার এরূপ মনের ভাব বুঝিয়া লীলার জন্যে বিন্দুবাসিনীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী স্বামীকে স্বমতে আনিবার জন্যে পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ করিল। এবার হঠাৎ একটা কথা মনে হইবামাত্র বলিল—"আচ্ছা, নরেন ত এ গ্রামের মধ্যে খুব ভাল ছেলে। সেত সোমনাথের সকল পরিচয়ই জানে, সে যখন অত জোর করে

বলছে—এ বিয়েতে কোন গোল হবে না, তখন তার কথাতেও কি তোমার বিশ্বাস হয় না?”

লোকনাথ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—“আর আমার এ বিষয়ে অমত নাই। বিন্দু, এই সোমবারেই সোমনাথের সঙ্গে আমি লীলার বিয়ে দেবো—তা এতে আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক। তুমি কালই গায়ে হলুদের উদ্যোগ কর।”

লোকনাথ ঐ কথা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, গৃহমধ্যস্থিতা রোরুদ্যমানা লীলাও সে কথা শুনিতে পাইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ সোমবার লীলার সহিত সোমনাথের বিবাহ। সোমনাথ এ বিবাহের সংবাদ তাঁহার দেশস্থ কোন আত্মীয় বন্ধুকে দেন নাই, সুতরাং এ বিবাহে তাঁহারা কেহ উপস্থিত নাই। এ বিবাহের বরকর্ত্তা ও আত্মীয় স্বজন সকলই তাঁহার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ—উভয় পক্ষ হইতেই আজ গ্রামস্থলোকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইবে কি না—এই কথা লইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামময় একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল। শেষে লোকনাথের বাড়ীতে আহারাদির বিরাট আয়োজনের কথাটা যখন গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের অনুগ্রহে সে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল।

শুভলগ্নে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। পর দিন প্রভাতে সস্ত্রীক লোকনাথ স্বদেশ যাত্রা করিলেন। লোকনাথ এবং নরেন্দ্রনাথকেও সেই সঙ্গে যাইতে হইল। লোকনাথের দেশ বিরামপুর। কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেল গাড়ীতে উঠিয়া বিরামপুরে যাওয়া যায়।

অতি প্রত্যুষে গাড়ী বিরামপুরে আসিয়া পৌঁছিল। লোকনাথ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল—ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। সিপাহি, বরকন্দাজ, সহিস, কোচম্যান এবং বহুসংখ্যক ভদ্রলোকে ষ্টেশন একবারে পরিপূর্ণ,—সকলেই উৎসুকনেত্রে গাড়ীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র, সেই অসংখ্য জনস্রোত হইতে শতসহস্র অভিবাদন ও সেলামের ধুম পড়িয়া গেল। লোকনাথের অধিকতর বিস্ময়ের কারণ এই তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন—তাঁহারই জামাতাকেই লক্ষ্য করিয়া সেই সকল অভিবাদন ও সেলাম হইতেছে! এবং তাঁহার জামাতাও সেই সকল অভিবাদন ও সেলামের প্রতিদান করিতেছেন! দেখিতে দেখিতে অসংখ্য সিপাহি ও বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত এবং মূল্যবান আচ্ছাদনে আবৃত একখানি সুন্দর পাল্‌কি তাঁহাদের সেই গাড়ীর দরজায় আসিয়া লাগিল। সোমনাথ স্বহস্তে লীলার হাত ধরিয়া সেই পাল্‌কির মধ্যে তাহাকে তুলিয়া দিলেন। লীলার তাৎকালিক মানসিক অবস্থার বিষয়ে আমরা এখনও কোন পরিচয় পাই নাই, কিন্তু পাল্‌কীতে তুলিবার সময় সোমনাথ দেখিল—লীলা এত অধিক ঘামিয়াছে যে সেই ঘামে তাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে!

লীলাকে পাঠাইয়া দিয়া সোমনাথ সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত সম্মানের সহিত সকলকেই সোমনাথের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া লোকনাথ একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। কথা কহিতে কহিতেই সকলে ষ্টেশনের বাহিরে

আসিলেন। সেখানে আসিয়া লোকনাথ দেখিল—গাড়ী, ঘোড়া, হাতী ও বাদ্যকর-গণ প্রভৃতিতে রাস্তা পরিপূর্ণ। আর সেখান হইতে যতদূর মাঠ দৃষ্টিগোচর হইতেছে—সে মাঠও অসংখ্য জনস্রোতে ভরিয়া গিয়াছে। চারব্যাং, বেরুচ্, ব্রুহাম, ফিটন, পাল্কি প্রভৃতি নানা ফ্যাসানের ও নানা বর্ণের গাড়ী সকল সুদৃশ্য ও বলবান অশ্ব-গণের সহিত সংযোজিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঢাক্, ঢোল, কাঁড়া, নগড়া, সানাই প্রভৃতি অসংখ্য বাদ্যকর-গণকে দূরে দেখা যাইতেছে। তাহাদের অগ্রে ধ্বজা আসাশোঁটা প্রভৃতিধারী অসংখ্য লোকও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সে দৃশ্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। লোকনাথের মুখে ত কথা নাই, লোকনাথ ভাবিতেছিল—এ সত্য—না স্বপ্ন? এই প্রশ্নের কোন রকম মীমাংসা করিতে না পারিয়া লোক-নাথ জিজ্ঞাসা করিল—"এত গাড়ী ঘোড়া, হাতী, লোকজন এ সকল কার?"

নরেন্দ্র উত্তর করিলেন—"এ সকল এ দেশের রাজার। রাজা সোমনাথকে বড় ভালবাসেন, সোমনাথ আজ বিবাহ করে আস্ছেন শুনে, রাজা নিজে বর কনেকে অভ্যর্থনা কর্‌তে ষ্টেশনে এসেছেন। তাই এ সব সেই রাজারই সঙ্গে এসেছে। এখন আমাদের প্রথমে সেই রাজার বাড়ীতেই যেতে হবে।"

লোকনাথ এতক্ষণে একটু সুস্থির হইল। স্বপ্ন বলিয়া মনে মনে যে একটা ভ্রম জন্মিয়াছিল, সে ভ্রমও দূর হইল। এই সময় সোমনাথ লোকনাথ ও নরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেই অসংখ্য গাড়ীর মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাড়ীখানিতে উঠিলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল।

লোকনাথ জীবনে কখন রাজা দেখে নাই। এখন রাজার এই সকল আস্‌বাব দেখিয়া রাজাকে দেখিবার জন্যে তাহার মন বড়ই ব্যস্ত হইল। লোকনাথ ব্যস্ততার সহিত কেবল চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সোমনাথ ও নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের রাজা কই? আমি কখন রাজা দেখিনি।"

সোমনাথ উত্তর করিলেন—"রাজ-বাড়ীতে গেলেই রাজাকে দেখ্‌তে পাবেন।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ী রাজবাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। সোমনাথ, নরেন্দ্র ও লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক মহলের দর্শনীয় বিষয় সকল দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বিনীতভাবে একজন সামান্য ভৃত্যের ন্যায় এই সকল দেখাইতেছিলেন। গৃহ-দেবদেবীগণকে প্রণামের পর, সোমনাথ লীলাকে অন্দরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং লীলা এ সময় সোমনাথের সঙ্গে ছিল না।

রাজবাড়ীদর্শন শেষ হইলে সোমনাথ লোকনাথকে বলিলেন "কাল সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে আপনার বড়ই কষ্ট হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম করে স্নানাহার করুন। আহারের পর রাজা-রাণী উভয়ে আপ-নাকে প্রণাম করে আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্‌বে।"

লোকনাথ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিতেছে না দেখিয়া নরেন্দ্র বলি-লেন—"আপনি সোমনাথের শ্বশুর, রাজা সোমনাথকে বড় ভাল বাসেন, সুতরাং আপনি রাজারও শ্বশুর। তবে আপনাকে প্রণাম কর্‌বেন না কেন?"

লোক। রাজাদের কি আমাদের মত লোককে প্রণাম কর্‌তে আছে?

নরে। আপনি যে সোমনাথের শ্বশুর,—এ কথা আপনাকে কতবার মনে করে দেবো?

লোক। আর তিনি যে রাজা—এ কথা আমি কি করে ভুলে যাব?

এইবার সোমনাথ বলিলেন—"আপনার কোন ভয় নাই, এই বাড়ীর রাজা ও রাণী আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করবে, আর অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সেবা করবে। এখানে আপনার কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই।"

লোক। যিনি রাণী তিনি আমার সাম্‌নে বেরুবেন কেন?

নরেন্দ্র উত্তর করিলেন—"তিনি ত আর বাহিরে আস্‌বেন না, অন্দরেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।"

লোকনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল—"সে কি! আমি রাজার অন্দরে যাব? রাজার অন্দরে গেলে গর্দ্দান যায় যে!"

এইবার সোমনাথ বলিয়া উঠিলেন—"বেলা হয়েছে—স্নানাহার করবেন চলুন।"

তখন আর অন্য কথা বন্ধ করিয়া নরেন্দ্র ও লোকনাথ উভয়েই মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে সোমনাথের সঙ্গে স্নানাহার উদ্দেশে চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এদিকে গৃহদেবতাগণকে প্রণামের পর লীলা এক সুসজ্জিত শয়নকক্ষে অতি যত্নের সহিত আনীত হইল। তখন সেই গৃহের আসবাবাদি দেখিয়া লীলার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। লীলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সেই রৌপ্য খাট ও স্বর্ণ টেবিল প্রভৃতির চাক্‌চিক্যে তাহার চক্ষু যেন ঝলসাইয়া যাইতে লাগিল।

লীলাত অবাক! কেবল ইহাই নহে। এইবার কোথা হইতে নববধূকে দেখিবার জন্যে অনেক স্ত্রীপুরুষ আসিল। এই আশীর্ব্বাদ ও নববধূ দর্শনব্যাপারে এত স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা স্তূপাকার হইল যে, লীলা তাহা দেখিয়া এ ঘটনাকে স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিল না।

এইবার দুইজন দাসী আসিয়া লীলাকে সৌগন্ধযুক্ত তৈল মাখাইয়া দিল। অন্য দুইজন দাসী গাত্র মার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে স্নান করাইল। স্নান শেষ হইয়া গেলে একখানি স্বর্ণথালে নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন লীলাকে জলযোগ করিতে দেওয়া হইল। লীলা কিছুই খাইতে পারিল না। অল্পক্ষণ পরেই আবার এক বাক্স অলঙ্কার আনিয়া দুইজন দাসীতে লীলাকে পরাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে অনেক জড়োয়া গহনাও ছিল। লীলাত অবাক্! সে জীবনে কখন সেরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার চক্ষে দেখে নাই।

দাসীদ্বয় ক্রমে ক্রমে যে যে অঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া দিল, লীলার সেই সেই অঙ্গে ভয়ানক ভার বোধ হইল—যেন পরের অঙ্গ বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। এই সময় সোমনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দাসীগণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লীলা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। তারপর দাসীগণ সে গৃহ হইতে একে একে চলিয়া গেল। এক লীলা ব্যতীত সে গৃহে অন্য কেহ রহিল না। সোমনাথ লীলার নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, এবং ধীরে ধীরে লীলার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন। এইবার লীলা সোমনাথের প্রতি চাহিয়া

দেখিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সোমনাথকে সামান্য পরিচ্ছেদে দেখিল না। সোমনাথের এরূপ বেশভূষা দেখিয়া লীলা আশ্চর্য্য হইয়া অনেকক্ষণ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সোমনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কি লীলা, তুমি আমায় চিন্তে পার নাই?"

লীলা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল—"চিন্তে পার্‌বো না কেন? এত বড় বাড়ী, এত ঐশ্বর্য্য, এই সব গহনা, টাকা মোহর—এ সব কার?"

সোমনাথ পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"এ সকলই তোমার লীলা।"

লীলা ত অবাক! তাহার মুখে আর কথা নাই। সোমনাথ লীলার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"লীলা, আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

লীলা উত্তর করিল—"আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আমার মাথা যেন কেমন ঘুর্‌ছে।"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতেই লীলা সেই খানে বসিয়া পড়িল। সোমনাথ আপন উরুতে লীলার মস্তক রাখিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর লীলা দাঁড়াইল, সোমনাথ আশ্চর্য্য হইয়া লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। লীলা এইবার প্রশ্ন করিল—"আমার বাবা কোথায়? বাবাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ বড় কেমন কর্‌ছে।"

সোমনাথও এবার স্থির হইয়া পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করিলেন, এবং লীলাকে আদর করিয়া বলিলেন—"তোমার বাবা এখনি আস্‌বেন, আস্‌বার জন্যে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এই সময় দরজার পরদা নড়িয়া উঠিল। প্রথমে নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহারই পশ্চাতে লোকনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়াই ঈষৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া লোকনাথকে বলিলেন—"আপনি যে রাজা ও রাণী দেখ্‌বার জন্যে এত অধৈর্য্য হয়েছিলেন, এই সেই রাজা ও রাণী।"

লোকনাথ প্রথমে কম্পিতহৃদয়ে একবার নরেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত রাজা ও রাণীর প্রতি চাহিল। কিন্তু একি! লোকনাথ কাহাকে দেখিতেছে? লোকনাথ নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না! এ যে তাহারই জামাতা ও কন্যা!

দরিদ্র লোকনাথের কন্যাই এখন বিরামপুরের রাজার রাণী লীলার অদৃষ্ট!

সমাজ-চিত্র।

সূর্য্যমুখী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালিকার মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হওয়া সম্ভব কি না—জানি না, কিন্তু মদনগঞ্জ-গ্রামে ঘোষেদের বিজয়ের সহিত সেই গ্রামের দত্তদের সূর্য্যমুখীর বড় ভাব ছিল। বিজয় আনন্দ ঘোষের একমাত্র পুত্র, আর সূর্য্যমুখী সনাতন দত্তের একমাত্র কন্যা। আনন্দ ঘোষ গ্রামের জমীদার—বনিয়াদী বড় লোক; আর সনাতন দত্ত কলিকাতায় নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া নূতন বড়-মানুষ হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে দত্তজের সহিত ঘোষ মহাশয়ের একটা কুটুম্বিতা করিবার ইচ্ছা জন্মিল। কারণ সূর্য্যমুখী মেয়েটি বড় সুন্দরী, তার উপর নূতন বড়-মানুষ সনাতন দত্ত একমাত্র কন্যার বিবাহে কোন্ না দশ টাকা খরচপত্র করিবেন? প্রথমে মেয়ে মেয়ে এই বিবাহের কথা উঠে, তার পর এক বৎসর পূজার সময় দত্ত মহাশয় বাড়ী আসিলে, এ সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইয়া যায়। তখন বিজয়ের বয়স বার বৎসর আর সূর্য্যমুখী সবেমাত্র সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে হইতেই এই দুই বালকবালিকার মধ্যে বিশেষ ভাব ছিল। তোমারা ইহাকে প্রণয় বলিবে—কি ভালবাসা বলিবে—জানি না, কিন্তু আমরা কোন কথা গোপন করিব না।

পূজার পর সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে, একদিন বৈকালে দত্ত বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বিজয় চলিয়া যাইতেছিল, সূর্য্যমুখী বিজয়কে বাড়ীর সম্মুখে পাইয়া—আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া আসিয়া ডাকিল—"বিজয়, আয় না ভাই—খেলা করি।"

বিজয় প্রথমে একবার চারিদিক চাহিল। পরে বলিল—"তোর সঙ্গেত আমার আর খেলা করতে নেই।"

সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল মুখখানি তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ হইয়া গেল। সূর্য্যমুখী সেই বিষণ্ণ-মুখে বলিল—"কেন ভাই, আমি কি দোষ করেছি?"

সূর্য্যমুখীর বিষণ্ণমুখ দেখিয়া বিজয় আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি বলিল—"না সূর্য্যমুখী, তুই দোষ কর্‌বি কেন? এখন আগেকার মতন দুজনকে দেখ্‌লে লোকে যে নিন্দে কর্‌বে।"

সূর্য্যমুখী এবার আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কেন নিন্দে করবে ভাই? সে দিন বামুনদের সতীশ খেলা কর্‌তে এসে আমায় বড় মেরেছিল। মা তাই কেবল তোর সঙ্গে খেল্‌তে বলে দিয়েছে। আমাদের বাড়ীতে আয় না ভাই, মা তোকে দেখলে কত আহ্লাদ করবে এখন। আমি কেমন পুতুলের কাপড় সব আজ ছুকুর

খেলা ঘর করেছি। আমার পুতুলের সঙ্গে তোর পুতুলের বিয়ে দিবি?”

বিজয় এবার হাসিয়া বলিল—“সূর্য্যমুখী, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে যে—তা তুই জানিস্?”

সূর্য্যমুখী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—“হাঁ, তাও আমি জানি।”

বিজয় সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল—“কি করে জান্‌লি বল্ দেখি।”

সূর্য্যমুখী এবার ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বুক ফুলাইয়া বলিল—“কেন? মা বলেছে—তুই যে আমার বর।”

বিজয়। তা বরের সঙ্গে কি খেলা কর্‌তে আছে?

সূর্য্যমুখী। কেন, আমিত তোমার সঙ্গে বরাবরই খেলা করি।

বিজয়। বরের সঙ্গে ক'নে খেলা কর্‌লে, লোকে নিন্দে কর্‌বে যে।

সূর্য্যমুখী। তবে তোকে আমি বিয়ে কর্‌বো না, আমি তোর সঙ্গে বরাবর খেলা কর্‌বো।

সে প্রস্তাব বিজয়ের কিন্তু ভাল লাগিল না। বিজয় তখন একবার চারিদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল,—“তবে আমাদের বাগানবাড়ীতে চল্, সেখানে দুই-জনে খেলা কর্‌বো এখন।”

সূর্য্যমুখী কহিল—“কেন? আমি কেমন আমাদের ছাদে খেলাঘর করেছি, তুই আর আসিস্‌নে বলে আমি সে খেলাঘরে খেলিনি। সেই যে এক দিন দুজনে ‘বউ বউ’ খেলেছিনু; তুই বর হয়েছিলি, আর আমি ক'নে হয়েছিলুম। তুই না এলে আমার আর খেলা হয় না, আমার আর কারু সঙ্গে ভাই, খেল্‌তে ইচ্ছে করে না।”

এমন সময় সূর্য্যমুখীর ঠাকুর-মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয় তাহাকে দেখিয়া সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ ভোঁ করিয়া দৌড় দিল, আর সূর্য্যমুখী বিস্মিতনেত্রে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সূর্য্যমুখীর ঠাকুর-মা তখন হাসিতে হাসিতে বলিল—“কি লো সূর্য্যমুখী, বরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিলো?”

সূর্য্যমুখী তখন ছল্ ছল্ নেত্রে বলিল—“বিজয় আমার সঙ্গে খেল্‌তে চায় না কেন ঠাকুর-মা?”

সূর্য্যমুখীর ছল্ ছল্ নেত্র দেখিয়া তাহার ঠাকুর-মার আহ্লাদের সীমা নাই; তিনি হাসিতে হাসিতে একবারে ভূমিতে লুটিয়া পড়িতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন—“হাঁলো? তুই যে এরই মধ্যে বরের জন্যে পাগল হয়ে উঠ্‌লি!”

ঠাকুর-মার কথায় সূর্য্যমুখীর বড় রাগ হইল। সে রাগ করিয়া সেই দিন তাহার এত সাধের খেলাঘর সমস্ত ভাঙ্গিল। সেই দিন হইতে সে আর কাহার সহিত খেলা করিত না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তার পর আরো দুই বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। এখন সূর্য্যমুখীর জ্ঞান হইয়াছে। বিজয়ের সহিত তাহার দেখা হইলে, সূর্য্যমুখী এখন আর হাসিতে হাসিতে বিজয়ের নিকট দৌড়িয়া যায় না। বিজয় তাঁহাকে গোপনে কোন কথা বলিতে আসিলে এখন বরং সূর্য্যমুখী সেখান হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। হঠাৎ কোন স্থানে দেখা হইলে সূর্য্যমুখী এখন লজ্জায় চক্ষু দুটি অবনত করে, আর বিজয় সুবিধা পাইলেই অমনি তাহার সেই লজ্জাবনত মুখকমলের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতে থাকে।

এরূপ সুবিধা কিন্তু সকল সময় ঘটিয়া উঠিত না। সেই কারণ, বিজয় অনেক সময় দত্তবাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। অথচ বিনা কারণে, সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণের সূর্য্যমুখীর সহিত দেখা করিতে পারিত না। তবে কখন কখন সূর্য্যমুখী নিমন্ত্রিত হইয়া বিজয়দের বাড়ী আসিত, আবার কখন বা বিজয় নিমন্ত্রিত হইয়া সূর্য্যমুখীদের বাড়ী যাইত। কিন্তু এরূপ নিমন্ত্রণ ত আর সচারাচর ঘটিত না, কাজেই অনেক সময় বিজয়কে দত্ত বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সূর্য্যমুখী কি করিত? সে এখন বড় লজ্জাবতী। বিজয়কে দেখিবার ইচ্ছা হইলে, সে সুবিধা পাইলেই বিজয়কে ফাঁকি দিয়া—গোপনে ছাদের উপর হইতে তাহাকে দেখিত। আর এদিকে বিজয় ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিষণ্নমনে গৃহে ফিরিত। বালিকার দুষ্টমি দেখিলে?

বিজয়ের সে নৈরাশ্যেও সুখ ছিল। সুখ না থাকিলে সে প্রতিদিন এইরূপে দত্তবাড়ীর চারিদিকে কেন, বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইবে? আর সূর্য্যমুখী অবশ্যই গোপনে বিজয়কে দেখিয়া সুখী হইত। কিন্তু এই সুখের সময় একটা দুঃখের কথা বলি শোন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সনাতন দত্তের কলিকাতায় অনেক রকম কারবার ছিল। কি জানি কেন দত্তজের সেই সকল কারবারে হঠাৎ অনেক টাকা দেনা দাঁড়াইল। তখন এক একটি করিয়া ক্রমে তাঁহার সমস্ত কারবার নষ্ট হইয়া গেল। তথাপি দেনা গেল না,—কাজেই দত্তজের বিষয়সম্পত্তির উপর টান পড়িল। এই সময় দত্তজ একবার দেশে আসিয়া আনন্দ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত কথা শুনিয়া ঘোষ মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন।

অনেক রাত্রি বসিয়া একটা পরামর্শ হইল, কিন্তু সনাতন সে পরামর্শে সম্মত হইলেন না। সনাতন বলিলেন—"আমি অধর্ম্ম করতে পারবো না, সমস্ত বেচে-কিনে দেনা দেবো।"

আনন্দ ঘোষ তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তা হলে খাবে কি? তোমার স্ত্রী পরিবারের উপায় কি হবে?"

সনাতন। অদেষ্টে যা আছে, তাই হবে, তা বলে অধর্ম্ম করবো? বিষয় থাকতে পাওনাদারদের ফাঁকি দেবো?

আনন্দ। আমি অধর্ম্ম করতে বলছি না—কাকেও ফাঁকি দিতেও বলছি না। কারবারের দেনা, কারবার থেকে যতদূর হয়, শোধো। সমস্ত পাওনাদারকে ভাগ করে দিয়ে দেউলিয়া হও; আর বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সব বেনামী করে রাখ—সকলেই ত এইরূপ করে থাকে।

সনাতন। সকলে করে করুক, কিন্তু আমি তা পারবো না।

আনন্দচন্দ্র এইবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তবে তুমি ধর্ম্ম নিয়েই থাক—তোমার বিষয়বুদ্ধি কিছুই নেই।"

সনাতন। নীলামে বিক্রি হলে মাটির দরে বিক্রি হয়ে যাবে, তাহলে বিষয়ও যাবে, আর দেনাও থাকবে। আপনি দাঁড়িয়ে, আমার এই দায় থেকে উদ্ধার করুন; আপনি দাঁড়ালে সে বিষয়ের দরও হবে। তাই আপনার শরণাগত হয়েছি।

আনন্দচন্দ্র অবজ্ঞাসূচক ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার কোন সম্পর্কে থাকবো না; মনে করেছিলুম—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের

দিয়ে দিয়ে একটা সুখী দিতে করবো, কিন্তু আজ আমি সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করলুম। তুমি তোমার কন্যার অন্য পাত্র স্থির করো।”

বাল্যকাল হইতে উভয়ের মধ্যে একটা বন্ধুত্বও ছিল, সেই কারণ, বন্ধু আনন্দচন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া দত্তজ মহাশয়ের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল। আর একটিও কথা তিনি বলিলেন না, কেবল নীরবে দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া বিষণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

কি সর্ব্বনাশ! তবে বিজয় আর সূর্য্যমুখীর দশা কি হইবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেবল ভদ্রাসন বাড়ীখানী আর সামান্য জমী জমা ব্যতীত সনাতনের আর কিছুই নাই। দেনা পরিশোধের জন্য সনাতনকে সমস্তই বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। যাহার পাঁচসাত লক্ষ টাকা কারবারে খাটিত, আজ সে উদরান্নের জন্য লালায়িত! মা কমলা, তুমি এরূপ ধার্ম্মিক লোকের গৃহে অচলা না হইয়া চঞ্চলা হইলে কেন মা?

সনাতন কিন্তু তাহার জন্য দুঃখিত নহেন। তাহার সন্তোষের কারণ—সে এখন অঋণী হইয়াছে। তবে সনাতনের দুঃখ কেবল তাহার সেই কন্যাটির জন্যে, সনাতন এখন কন্যার পাত্র পাইবে কোথায়? পাত্র অনেক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কন্যা পাত্রস্থ করিতে যে অর্থের আবশ্যক, সনাতনের এখন ত আর সে সঙ্গতি নাই, সুতরাং তাহার ভাবনার কথাইত বটে। আর এক ভাবনার কথা বলি—শোন। এক দিন সনাতনের গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট আসিয়া বলিল—“ওগো যেমন করে পার, বিজয়ের সঙ্গে আমার সূর্য্যমুখীর বিয়ে দাও; আমি না হয়, মেয়েটির হাত ধরে ঘোষেদের বাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। বিজয়কে আমি ছেলের মতন ভালবাসি, ওকে দেখ্‌লে এখন আমার প্রাণ ফেটে যায়।”

সনাতন তৎক্ষণাৎ বলিলেন—“যা প্রাণ থাকতে হবে না, তার জন্যে বৃথা অনুরোধ করো না। গ্রহবশতঃ ধন হারিয়েছি—কিন্তু স্বইচ্ছায় মান হারাতে পারবো না।”

গৃহিণী পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“তবে কি হবে? অন্যত্রে বিয়ের কথা হলে, আমার সূর্য্যমুখীর চক্ষু দুটি অমনি ছল্ ছল্ করতে থাকে; আর তাই দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। আমি স্বচক্ষে গোপনে থেকে দেখেছি, বিজয়ও এক দিন আমার সূর্য্যমুখীকে দেখে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো। আমিও তাই দেখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলুম! এর কি কিছু উপায় হতে পারে না?? আমি যে আর সে সকল চক্ষে দেখ্‌তে পারি না।”

সনাতন দৃঢ়তার সহিত স্থিরভাবে বলিলেন—“দেখ্‌তে না পার, মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল, সব আপদ চুকে যাবে।”

গৃহিণী অমনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—“অমন কথা মুখে আন্‌লে কি করে!”

একটা মর্ম্মবেদনায় সনাতনের মস্তিষ্ক স্থির ছিল না, কিন্তু সনাতন তথনও বাহ্যিক স্থিরভাবে বলিলেন—“কেবল মুখে বলা নয়, আমি স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে বলিদান দিতে পারি, তবুও আর আনন্দ ঘোষের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারি না।”

গৃহিণী আর সেথানে দাঁড়াইল না। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সে স্থান হইতে আর একটী

বালিকা এই সকল কথা গোপনে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, সে গৃহিণীকে গৃহের বাহিরে আসিতে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বালিকাটি কে?

সূর্য্যমুখীর বয়ঃক্রম এখন দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং যৌবনসুলভ চিহ্নের পূর্ব্বাভাস এখন তাহার অঙ্গে দেখা দিয়াছে। সূর্য্যমুখীর বিবাহের জন্তে এখন তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই উদ্বিগ্ন, কিন্তু সূর্য্যমুখী এখন বিবাহের পরিবর্ত্তে আপনার মৃত্যুকামনায় প্রতিদিন সকল গ্রাম্যদেবতার দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া আসিত। সে বালিকা আর কি করিবে বল?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন এক দেবমন্দিরে এইরূপ মাথা খুঁড়িতে গিয়া সূর্য্যমুখীর সহিত নির্জ্জনে বিজয়ের সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! কাহার মুখে কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। সূর্য্যমুখী লজ্জায় কিছুক্ষণ অবনতমুখী হইয়া রহিল। তাহার প্রাণের ভিতর এই সময় কি হইতেছিল, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সূর্য্যমুখী অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল; তখন বিজয় প্রথমে কথা কহিল—"সূর্য্যমুখী, তুমি একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

সূর্য্যমুখী তখন পুনরায় অধোবদনে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিজয় এইবার আরম্ভ করিল—"আমি তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে একবার সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্তে অনেক দিন থেকে চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু এতদিনের পর আজ বাবা পঞ্চাননের অনুগ্রহে আমার সে চেষ্টা সফল হয়েছে। আমি তোমায় একটি অনুরোধ কর্‌বো। আমার এ অনুরোধ রাখ্‌বে কি?"

ধীরে ধীরে অতি ধীরে তখন সূর্য্যমুখী উত্তর করিল—"কি অনুরোধ বল?"

বিজয়। আমি ছাড়া এ পৃথিবীর আর কাকেও বিয়ে কর্‌বে না প্রতিজ্ঞা কর।

সূর্য্যমুখী বিজয়ের কথা শুনিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিল! তার পর একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমার প্রতিজ্ঞা কি আগে বল।"

বিজয় তখন উন্মত্তের ন্যায় মন্দিরের এক পার্শ্বে যে স্তূপাকার ফুল ও বিল্বপত্র পড়িয়াছিল, তাহার এক মুঠা হাতে লইয়া বলিল—"আমি দেবতার ফুলবিল্বপত্র হস্তে দেবতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করছি যে, তুমি ভিন্ন এ জীবনে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বো না, তুমি ছাড়া এ হৃদয়ে আর কাকেও স্থান দেবো না। তোমায় ভিন্ন এ প্রাণ থাকতে আর কাকেও ভালবাস্‌বো না। এ প্রতিজ্ঞার যদি কিছুমাত্র অন্যথা করি, তবে বাবা পঞ্চানন আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত করেন।"

সূর্য্যমুখী স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ বিজয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! তার পর ধীরে ধীরে বিজয়ের হস্ত হইতে কম্পিত-হস্তে সেই ফুলবিল্বপত্র লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—"তুমি ছাড়া এ পৃথিবীর আর কাকেও আমি ভালবাস্‌বো না।"

কিন্তু বিজয় সূর্য্যমুখীর এরূপ ক্ষীণ প্রতিজ্ঞায় সেরূপ সন্তুষ্ট হইল না। বিজয় অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল—"তবে আমি ছাড়া অন্তকে কি তুমি বিবাহ কর্‌বে সূর্য্যমুখী?"

সূর্য্যমুখীর মুখে আর কথা নাই নীরবে অধোবদনে থাকিয়া সে প্রশ্নের

উত্তরে কেবল একটি মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল —"আমি ছাড়া আর কাকেও কি তোমার হৃদয়ে স্থান দেবে সূর্য্যমুখী ?"

বলিতে বলিতে বিজয়ের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিল না। কেবল দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল, বিজয় অনিমিষনয়নে সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিল। তার পর যখন সূর্য্যমুখী অদৃশ্য হইল, তখন পুনরায় উন্মত্তের ন্যায় বিজয় বলিল—"সূর্য্যমুখী, তুমি আমার। আমি ছাড়া কেউ তোমার বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না। যেখানেই তুমি থাক, তুমি আমার। আমার বাবা আমার জীবন কেড়ে নিতে পার্‌বেন, কিন্তু তোমায় কেড়ে নিতে পার্‌বেন না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে অন্যত্রে বিজয়ের একটা সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। বিজয়ও তখন জননীকে স্পষ্ট বলিল—"মা, তুমি বাবাকে স্পষ্ট বল, আমি এখন বিয়ে কর্‌বো না; তিনি যদি এ বিয়ে স্থির করেন, তবে আমি ঘর থেকে চলে গিয়ে বিবাগী হবো।"

কাজেই তখন সে বিবাহ স্থগিত হইল। আনন্দচন্দ্র ভার্য্যার সহিত পরামর্শে স্থির করিলেন, সনাতন দত্তের কন্যার বিবাহ না হইয়া গেলে, আর তিনি পুত্রের বিবাহের কথা কোথাও উত্থাপন করিবেন না।

দুই মাস পরেই দত্তজের কন্যার পাত্র স্থির হইল। দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র, কিন্তু খুব ধনবান। আর প্রথম পক্ষের কোন সন্তান সন্ততি নাই। পাত্রের বাড়ী কলিকাতায়। পাত্র স্বয়ং হর্ত্তা, স্বয়ং কর্ত্তা, স্বয়ং আসিয়া কন্যা দেখিয়া গেলেন। সে কন্যা দেখিয়া পাত্র মোহিত হইলেন, সুতরাং দত্তজের এক পয়সা ব্যয় নাই।

এরূপ পাত্র কি সনাতন ছাড়িয়া দিতে পারেন ? তখন বিবাহের একটা দিন স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে গ্রামময় এ সংবাদটাও রাষ্ট্র হইল। এ দিকে কিন্তু সে সংবাদ বিজয়ের [illegible] অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! এ পর্য্যন্ত বিজয়ের আশা —সূর্য্যমুখী তাহার ভিন্ন, আর কাহারও হইবে না!

সূর্য্যমুখী কি করিবে ? সে বালিকা। সে সেই বিবাহের উৎসবের মধ্যে নীরবে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পিতার মান-মন্দিরে নিজের জীবন বলি দিল, সুতরাং শুভক্ষণেই হউক, আর অশুভক্ষণেই হউক, সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইয়া গেল! বিজয় ভাবিল—এত সূর্য্যমুখীর বিবাহ নয়—এ যেন ঠিক পিতৃহস্তে সূর্য্যমুখীর ছ্যাড়াং ডেডাং ড্যাং!

সূর্য্যমুখীর প্রাণটাও যেন কাটা ছাগলের মত ছট্ ফট্ করিতে লাগিল! কিন্তু তাহা হইলে আর কি হইবে ? এখন আর ত কোন উপায় নাই। সূর্য্যমুখী এখন আর কি করিবে ? প্রজ্বলিত অগ্নিরাশিতে নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় নীরবে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইতে লাগিল! আর বিবাহের পর দিনেই বিজয় কতকটা আত্মজয় করিতে সমর্থ হইল! সে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। পিতার অতুল সম্পত্তি, জনকজননীর অপার স্নেহ, স্বদেশের অনন্ত মায়া—কিছুতেই বিজয়কে গৃহে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নিরাশ-প্রণয়ে সন্তাপিত হৃদয় কি এতদূর অধীর হইয়া উঠে!

গৃহত্যাগ করিয়া বিজয় সন্ন্যাসী হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—যতদিন না সম্পূর্ণ আত্মজয় করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন আর গৃহে ফিরিবে না। অনেক তীর্থ ঘুরিল। অনেক দেবদেবী দেখিল। কিন্তু তাহার হৃদয়প্রতিষ্ঠিত দেবীপ্রতিমাকে সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না!

এদিকে আনন্দ ঘোষের সংসারেও একটা ভয়ানক বিভ্রাট পড়িয়া গেল। পুত্রশোকে বিজয়ের জননী উন্মাদিনী হইলেন। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বা 'বিজয় বিজয়' করিয়া চীৎকার করেন। আনন্দের সংসার এখন নিরানন্দময়! এ নিরানন্দের কারণ কিন্তু বিজয়ের পিতা স্বয়ং। এ কথা তিনিও এখন মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সেই অন্তর্নিহিত হৃদয়ভেদী দুঃখের পরিমাণ এখন কে করিতে পারে?

সনাতনের কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ না দিলে এতদূর যে ঘটিবে—এ কথা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। এখন কিন্তু উপায় নাই। নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও জমীদারী দান করিলেও যদি ইহার কোন উপায় হয়; আনন্দ আনন্দের সহিত তাহাতেও প্রস্তুত। আনন্দের জীবন দান করিলেও কি ইহার কোন প্রতিকার হয় না?

সূর্য্যমুখী শ্বশুরালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। মদনগঞ্জে আসিয়া সে বিজয়ের গৃহত্যাগের কথা সমস্ত শুনিয়াছে। সে কথা গ্রামের কেহ জানিতে আর বাকি ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ ভদ্র অভদ্র সকল মহালেই এই ঘটনার কিছুদিন ধরিয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। এ কথার প্রসঙ্গে কেহ কাঁদিল, কেহ বা হাসিল; কারণ গ্রামে শত্রুমিত্র সকলেরই আছে। যাহারা অন্য সময় হাসিত, সেই পুত্রশোকে উন্মাদিনী বিজয়ের জননীকে দেখিয়া কিন্তু তাহারাই আবার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। অনেকেই আনন্দ ঘোষকে এখন নির্ব্বোধ বলিয়া গালি দিত, কিন্তু পূর্ব্বে এ পরামর্শ তাহারা কেহই তাঁহাকে দেয় নাই। এই সকল আন্দোলনে সূর্য্যমুখীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইতে লাগিল। বিজয় তাহার জন্যে গৃহত্যাগী—এ কথা সেই বালিকার মনে উদয় হইলে, তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। তাহার স্বামীপ্রদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি তখন আর ব্যবহার করিতে তাহার ভাল লাগিত না। আর গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মন কিন্তু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইত। সে কাহার কাছে কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। মনে মনে দিবারাত্র বিজয়ের বিষয় চিন্তা করিত। অনেক সময় স্বপ্নে বিজয়কে দেখিতে পাইত। অনেক সময় "বিজয়—বিজয়" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। সে সময়—যে নিকটে জাগ্রৎ থাকিত, সেই শিহরিয়া উঠিত। সাবধান! সূর্য্যমুখী—সাবধান! এখন বিজয় তোমার পক্ষে পরপুরুষ! কিন্তু পোড়ারমুখী সূর্য্যমুখীর সে কথা সকল সময় মনে থাকিত না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে প্রায় দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। সূর্য্যমুখী এখন শ্বশুরালয়েই থাকিত। কিন্তু সেখানে থাকিলেও, বিজয়ের সংবাদ লইতে ভুলিত না। স্বামীগৃহে তাহার মন এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থির ছিল না। সে পাপিষ্ঠার মন বিজয়ের অনুসন্ধানে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইত

সূর্য্যমুখীর স্বামীর নাম—দেবেন্দ্রনাথ রায়। বাড়ী কলিকাতায় পটলডাঙ্গায়। রায় মহাশয় একজন সম্ভ্রান্ত ধনী লোক। কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীভাড়ার আয়—প্রায় মাসে হাজার টাকা। ইহা ব্যতীত জমীদারীর আয়ও বৎসরে ছয় হাজার টাকা হইবে। তাঁহার অন্য কোন ভ্রাতা বা সন্তানসন্ততি ছিল না। সুতরাং তিনি একাকী এই সকল আয় উপভোগ করিতেন।

সূর্য্যমুখীকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া কিন্তু রায় মহাশয় সুখী হইতে পারেন নাই। তিনি প্রাণপণে তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে মুখে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার গৃহে আসিয়া যে সে সুখী নয়, এ কথা তিনি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিতেন। এখন সূর্য্যমুখী পূর্ণযৌবনা, আর দেবেন্দ্র বাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। তথাপি, সূর্য্যমুখী একদিনের জন্যে স্বামীর সম্মুখে হাসিয়া কথা কয় নাই। তাহার জীবনেত আদৌ জোয়ার ভাটা ছিল না। সে জীবনস্রোত নীরবে ধীরে ধীরে একভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সে স্রোত যেরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে বোধ হয়—এ স্রোত বুঝি আর অধিক দিন বহিতে পারিবে না। রায় মহাশয় সূর্য্যমুখীর অসুখের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা করিয়া নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইতেন। তথাপি সূর্য্যমুখীর কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সে নিজে ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে কোনরূপ প্রশ্ন সম্ভাষণ করিত না। তবে স্বামী কোন প্রশ্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিত। আর স্বামী কোনরূপ আজ্ঞা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিত। স্বামীর অপ্রিয় কোনরূপ কার্য্য প্রাণ থাকিতে কখনই করিত না। দেবেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর মুখের প্রতি চাহিতে পারিতেন না। সে মুখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইত! একদিন দেবেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে বলিলেন,—"সূর্য্যমুখী, তোমার মুখ সর্ব্বদাই এরূপ বিষণ্ণ কেন? তোমার কি কষ্ট আমায় বল?"

সূর্য্যমুখী ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আমার কোন কষ্টই নাই।"

দেবেন্দ্র। তবে কি তোমার কোন ব্যারাম আছে?

সূর্য্যমুখী। আমার কোন ব্যারামই নাই।

দেবে। তবে তোমার সে রং কোথায় গেল—তোমার সে রূপ কোথায় গেল?

সূর্য্য। তা কি করে জান্‌বো?

দেবে। তুমি আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কও না কেন? আমি তোমায় কত ভাল বাসি, আর তুমি কি আমায় একটুও ভালবাস না?

সূর্য্যমুখী এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীরবে অবনতমস্তকে বসিয়া রহিল। দেবেন্দ্রনাথ পত্নীর সেই অবনত মস্তক চিবুক ধরিয়া উত্তোলন করিলেন, এবং হৃদয়ের আবেগে সেই লজ্জাবনত বিষণ্ণ মুখখানি দুই তিন বার গাঢ় চুম্বন করিলেন। কিন্তু চুম্বন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন—আসন্নমৃত্যু রোগীর অঙ্গের ন্যায় তাঁহার পত্নীর গণ্ডস্থল শীতল! বারম্বার চুম্বনেও কোন উত্তাপ অনুভব হয় না! তখন তিনি বিস্মিতনেত্রে পুনরায় সূর্য্যমুখীর মুখের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু এক বিষাদের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নাই! দেবেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন—"তোমার গাল এত ঠাণ্ডা কেন সূর্য্যমুখী?"

সূর্য্যমুখী উত্তর করিল—"কি জানি?"

দেবেন্দ্রনাথ তখন এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর করুণকণ্ঠে বলিলেন—"তোমার চেয়ে আমার বয়স অধিক হয়েছে বলে, আমি কি তোমার মনোমত নই সূর্য্যমুখী?"

সূর্য্যমুখী এই সময় কি ভাবিতেছিলেন, অন্যমনস্কে এ প্রশ্নের উত্তরেও বলিল—"কি জানি?"

দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় করুণস্বরে বলিলেন—"তোমার মনের কথা, তুমি না জান্‌লে কে জান্‌বে? সে কথা স্পষ্ট বল্‌তে কি তোমার চক্ষুলজ্জা হচ্ছে সূর্য্যমুখী?"

সূর্য্যমুখী তখন প্রশ্ন করিল—"কি কথা?"

দেবে। আমি তোমার মনোমত নই—এই কথা?

সূর্য্য। কে বলিল—তুমি আমার মনোমত নও?

দেবে। তবে তোমার মনের কথা কি আমায় স্পষ্ট করিয়া বল। তুমি যা চাও, আমি তোমায় তাই দেবো। তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌বো। আমি তোমায় সুখী কর্‌বার জন্য প্রাণ যে দিতে পারি।

সূর্য্য। আমি অসুখী কিসে?

দেবে। তোমার ঐ বিবর্ণ দেহ বলিতেছে—তুমি অসুখী। তোমার ঐ বিষণ্ণ মুখ বলিতেছে—তুমি অসুখী। তোমার ঐ থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বলিতেছে—তুমি অসুখী। তোমার ঐ জ্যোতিঃহীন চক্ষু বলিতেছে—তুমি অসুখী। আমি তোমার স্বামী, আমার কাছে এ কথা গোপন করা কি তোমার উচিত? আমি নিশ্চয় বল্‌ছি—তুমি অসুখী।

সূর্য্য। তবে আমি অসুখী।

দেবে। কেন অসুখী বল?

সূর্য্য। আমি সূর্য্যমুখী, তাই অসুখী।

দেবে। বুঝ্‌লাম না।

সূর্য্য। তবে আর আমি বল্‌বো না।

দেবেন্দ্রনাথ আর সে স্থানে থাকিতে পারিলেন না। গৃহের বাহিরে আসিয়া দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া মনে মনে বলিলেন—"আমি সূর্য্যমুখীকে বিয়ে করে বড়ই কুকর্ম্ম করেছি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে সনাতন পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করিয়া আবার আপনার অবস্থার উন্নতি করিল। দত্ত বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণের আবার ধুম লাগিয়া গেল। দত্তজের দুঃখের সংসার আবার সুখের সংসার হইল। কিন্তু বিজয় আর দেশে ফিরিয়া আসিল না। আনন্দ ঘোষ মনে মনে ভাবিত—সকলের যদি সব হইল, তবে তাহার বিজয় দেশে ফিরিয়া আসিল না কেন? ঘোষজের এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়?

দত্তজের সুখের সংসারে হঠাৎ একদিন দুঃখ দেখা দিল। দুঃখকে কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। একদিন দিবা দুইপ্রহরের সময় দত্তজের গৃহ হইতে একটা ক্রন্দনের রোল শোনা গেল। সে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনের ধ্বনি যে শুনিল, সেই তার কারণ জানিবার জন্য দত্তবাড়ীর দিকে ছুটিল। সে ক্রন্দনের কারণ আর কিছুই নয়—সূর্য্যমুখীর কপাল পুড়িয়াছে—সূর্য্যমুখী এই বয়সেই বিধবা!

সূর্য্যমুখী বিধবা হইল বটে, কিন্তু এখন বিলক্ষণ ধনী। সূর্য্যমুখীর স্বামী অতুল ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে সকল

সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী—সূর্য্যমুখী। স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া সূর্য্যমুখীর প্রথম কার্য্য হইল—তীর্থভ্রমণ। সূর্য্যমুখী ভারতের কোন্ তীর্থ বাকি রাখিল না। কিন্তু তার সে তীর্থভ্রমণের কোন ফলই হয় নাই। কারণ, পাপিষ্ঠা সূর্য্যমুখী তীর্থে তীর্থে অন্য এক জনের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত। সে পাপিষ্ঠা মনে মনে ভাবিত—এই তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সেই দেবতাই তাহার ইষ্টদেব!

যখন একে একে সকল তীর্থ ঘুরিয়াও কোন ফল হইল না, তখন পোড়ার-মুখী বিষণ্নমনে দেশে ফিরিয়া আসিল। দেশে ফিরিয়া আসিয়া একদিন সূর্য্যমুখী কালী-দর্শনমানসে কালীঘাটে গেল। কালীবাড়ীর মধ্যে সে যখন প্রবেশ করিতেছিল, সম্মুখে নাটমন্দিরের উপর দেখিল—তীর্থে তীর্থে যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল, সেই ইষ্ট-দেব—সন্ন্যাসীবেশে তাহারই সেই ইষ্টদেব!

আর কালীমন্দিরে প্রবেশ করা হইল না। সঙ্গিনীগণ কালীদর্শন করিতে গেল, আর সে অমনি ধীরে ধীরে কম্পিতহৃদয়ে নাটমন্দিরে গিয়া উঠিল। কেন যে সে সময়—সে পাপিষ্ঠা মূর্চ্ছিতা হইল না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

তার পর সেই সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী বিস্মিতনেত্রে অনেকক্ষণ সূর্য্যমুখীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সূর্য্যমুখী গললগ্নবাসে করুণকণ্ঠে বলিল,—"প্রভু! এ হতভাগিনীকে চিন্‌তে পারেন কি?"

প্রফুল্লমুখে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"চিনিয়াছি! আশীর্ব্বাদ করি—ধর্ম্মে যেন তোমার মতি অচলা থাকে।"

পাপিষ্ঠা এইবার বলিল—"আজ এক-বৎসর ধরে আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্যে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি—অনেক কষ্টে আজ দর্শন পেলেম।"

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমার জন্যে তোমার তীর্থভ্রমণ! কেন আমি তোমার কে?"

সেই বিজয়ের মুখে এই কথা! পাপি-ষ্ঠার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে—কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"আপনি এই হতভাগিনীর জন্যেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, আমি আপনাকে অনুসন্ধান না কর্‌লে আমার ধর্ম্ম থাক্‌বে কেন?"

সন্ন্যাসী তখন দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"যে নারী মনে মনেও পরপুরুষের বিষয় চিন্তা করে; তার ধর্ম্ম কোথায়! যে এক সময় তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরেই তুমি তার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছ! তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠা আর কে আছে? আমি এক দেবীপ্রতিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে, গৃহত্যাগী হয়েছিলুম। এতকাল যেখানেই থাকি, সেই দেবীপ্রতি-মারই পূজা করে আস্‌ছি। আমি জান্‌তুম সে দেবী, এখন—"

সেই সময় সূর্য্যমুখী বলিল—"প্রভু, এ দাসী কোনকালেই দেবী নয়, বরাবরই মানবী। আমি তোমারই আজন্ম দাসী।"

সন্ন্যাসীর মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বজ্র-গম্ভীর শব্দ হইল—"সূর্য্যমুখী কলঙ্কিনী।"

উন্মাদিনীর ন্যায় সূর্য্যমুখী চীৎকার করিয়া উঠিল—"কলঙ্কিনী না সূর্য্যমুখী?"

পুনরায় সেইরূপ গম্ভীর বজ্রনাদ হইল—"পোড়ারমুখী—কলঙ্কিনী!"

সূর্য্যমুখীর মাথায় যেন সত্য সত্যই

বজ্রাঘাত হইল! এবার কিন্তু সূর্য্যমুখী বিনীতস্বরে বলিল—"আমি আজীবন তোমারই চরণ ধ্যান করে আসছি, তোমা-কেই আমার ইষ্টদেব মনে করি। তোমা-কেই আমি প্রতিদিন পূজা করি। তোমা-রই সম্মুখে মহাদেবের ফুলবিল্বপত্র হস্তে প্রতিজ্ঞা করেছি—যতদিন বাঁচ্‌ব, তোমায় হৃদয়ের সহিত ভালবাসিব। তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, তুমিই আমার সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। আমি তোমারই সম্মুখে সত্য করছি—এ হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যেও অন্য কেহ স্থান পায় নাই! আজ তোমার মুখেই শুনিলাম, তুমি এখনও আমায় চরণে স্থান দিয়ে রেখেছ। পোড়ারমুখী বল্‌তে পার, কিন্তু তুমি আমায় কলঙ্কিনী বলো না। আর তুমি অন্তর্য্যামী, তুমি আমার হৃদয় জান। তুমি আমায় কলঙ্কিনী বলো না। আমি অন্তর্য্যামীর নিকট কলঙ্কিনী নই।"

পুনরায় সেই গম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসী বলি-লেন—"সূর্য্যমুখী, এখন তুমি সকলের নিকট কলঙ্কিনী। যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা করে, সেই কলঙ্কিনী।"

বার বার তিনবার। সে ক্ষুদ্র প্রাণে আর কত সহ্য হইতে পারে? সূর্য্যমুখী সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিতে গিয়া দেখিলেন—কল-ঙ্কিনী পাপিষ্ঠা সূর্য্যমুখীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে! তখন সেই মৃতদেহ ক্রোড়-স্থিত সন্ন্যাসীর চক্ষেও দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কি! পাপিষ্ঠা কলঙ্কিনীর মৃত্যুতে জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর চক্ষে অশ্রুজল!

সন্ন্যাসীর অবশিষ্ট জীবন, সেই দুইবিন্দু অশ্রুজলের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে কঠোরতর সাধনায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল!

সমাজ-চিত্র।

প্রেমের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কি সুন্দর।

দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক এক বালক কি সুন্দর! অষ্টম বৎসরবয়স্ক এক বালিকা কি সুন্দর! উভয়ে উভয়ের মুখপানে অতৃপ্ত-নয়নে চাহিতেছে আর মনে মনে ভাবিতেছে—কি সুন্দর!

বালিকার নাম সুলোচনা। সুলোচনা, অমরনাথ ঘোষের অতি যত্নের—অতি আদরের—অতি স্নেহের—অতি ভালবাসার একমাত্র কন্যা। অমরনাথের আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। অমরনাথ, প্রতাপপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার। জমীদারীর আয় বৎসরে প্রায় ১৬।১৭ হাজার টাকার কম নহে। তবে অমরনাথের শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কারে 'সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা' পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান! এদিকে ইংরাজীবিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি তথাকথিত অনেকগুলি সদনুষ্ঠানও তাঁহারই দ্বারাই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত।

আর বালকের নাম—ললিতমোহন। ললিতমোহন, সদানন্দের একমাত্র পুত্র। সদানন্দ, অমরনাথের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য। সদানন্দ পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য করিতেন। অমরনাথের অনুরোধে, কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রতাপপুরের উপাচার্য্যরূপে প্রেরিত হন। সে আজ ছয় বৎসরের কথা। তিনি অতি দরিদ্র। অমরনাথের অনুগ্রহেই কোন রকমে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

ললিতমোহন যখন সুলোচনার সেই সুন্দর মুখপানে চাহিয়া ছিল, তখন প্রাতঃ-সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছিল, আর সুলোচনার সেই কুণ্ডলাকৃতি কেশদাম উড়াইয়া উড়াইয়া, একবার সেই মুখখানি ঢাকিতেছিল, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই কেশদাম অপসৃত করিয়া ললিতমোহনের অতৃপ্ত-লোচনোপরি সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ ধরিতেছিল। ঠিক যেন ঝটিকা-তাড়িত ছিন্ন ভিন্ন কাদম্বিনী পূর্ণশশধরকে লইয়া, লুকোচুরি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। উভয়ে অনিমিষনয়নে উভয়কে দেখিতেছিল, আর মনে মনে বলিতেছিল—"কি সুন্দর! ঐ মুখখানি কি সুন্দর!"

এই সময় বস্ত্রাঞ্চল লুক্কায়িত একটি আম্র বাহির করিয়া সুলোচনা কহিল,—"ললিত, এই আম্রটি তুমি খাও।"

বিস্মিত হইয়া, ললিতমোহন কহিল—"সুলী, এ সময় তুই আম পেলি কোথায়?"

সুলোচনা। কাল রাত্রে বাবা কল্‌কাতা থেকে এনেছে। তাই মা,

আমাকে খেতে দিয়েছিল; আমি না খেয়ে তোমার জন্যে রেখেছি।

ললিত। আমি ও আম খাব না। তুই খা। তোর মা শুনলে তোকে খুব বক্‌বে।

সুলোচনা।—তা বকুক, তুমি খাও।

ললিত।—আমি কখনও খাব না, তুই খা। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে। তুই আমার সাম্‌নে খা না ভাই।

সুলোচনার চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিতে আরম্ভ করিল। সুলোচনার উন্নতমুখ ধীরে ধীরে অবনত হইয়া পড়িল। তখন ললিত-মোহন কহিল—"দে সুলী, এক কামড় খাই।"

আহ্লাদে বালিকার মুখখানি যেন ফুটিয়া উঠিল। স্মিতমুখে স্বহস্তে ললিত-মোহনকে সেই অসময়ের আম্র-ফলটি খাওয়াইল। সেই অর্দ্ধ-ভুক্ত আমটি আবার ললিতমোহনও সুলোচনাকে খাওয়াইল। তখনও সুলোচনার লোচন-পল্লব-প্লাবিত পতনোন্মুখ দুই বিন্দু অশ্রু, মুক্তাফলের ন্যায় তাহার গণ্ডস্থলে শোভা পাইতেছিল। কিন্তু এদিকে সুলোচনার মুখে আর হাসি ধরে না। একত্রে রৌদ্র-বৃষ্টির সম্মিলন না কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরে, দরিদ্র-পুত্র ললিতমোহন এবং ধনবান-কন্যা সুলোচনার ভালবাসাই বল, আর প্রণয়ই বল, ক্রমে গাঢ়তর হইয়াছে। এমন সময়, হঠাৎ একদিন ললিতমোহন শুনিল—"রাইপুরের জমীদার প্রতাপের সহিত সুলোচনার বিবাহসম্বন্ধ চলিতেছে। সেই প্রতাপ, আজ সুলোচনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

অকস্মাৎ বিনা-মেঘে ললিতমোহনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! ললিতমোহন, দৌড়িয়া অমরনাথের গৃহে আসিল। আসিয়া দেখিল—তাহার প্রাণের সুলোচনা সেই প্রতাপের সহিত একত্রে বসিয়া গল্প করিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে একটা ভীষণ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইল। সুলোচনা পূর্ব্বের ন্যায় সাদরে ললিত-মোহনকে অভ্যর্থনা করিল বটে; কিন্তু তাহাতে ললিতের সেই হৃদয়নিহিত অসহ্য যন্ত্রণার কোন উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল। সুলোচনার সুমিষ্ট কথা সে সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কার্য্য করিল। ললিতমোহন নৈরাশ্যের নিদারুণ পীড়ন, হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া, ধীরে ধীরে তথায় উপবেশন করিল। প্রতাপ দার্জ্জিলিং পরিদর্শন করিয়া আজ সবে মাত্র সুলো-চনার গৃহে আসিয়াছেন। তিনি তখন দার্জ্জিলিঙ্গের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতেছিলেন। আর সুলোচনা আগ্রহের সহিত তাহাই শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে সুলোচনা কহিল,—"প্রতাপ বাবু, দার্জ্জিলিং হইতে আমার জন্য কি আনিয়াছেন?"

প্রতাপ বাবু হাসিয়া কহিলেন—"তোমায় উপহার দেবার মতন কোনও জিনিষই আনি নাই। তবে সেখানকার কয়েকখানা সুন্দর 'ভোজালি' এনেছি; তাহারই একখানা দিচ্ছি।"

এই কথা বলিয়া, প্রতাপ পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া, একখানি সুন্দর 'ভোজালি' সুলো-চনার হস্তে দিলেন। সুলোচনা, আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিল। কিন্তু সে ভোজালি যে তখন ললিতমোহনের হৃদয়ে

প্রবেশ করিবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অসহ্য! অসহ্য! ললিতমোহনের প্রাণের জ্বালা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সময়, প্রতাপ, কোনও কার্য্যোপলক্ষে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন সুলোচনার দৃষ্টি ললিতমোহনের উপর পতিত হইল। সুলোচনা, ললিতমোহনের সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আকুল-প্রাণে কহিল,—"ললিত, তোমার মুখ এমন শুষ্ক কেন?"

ললিত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"আর সে কথায় কাজ কি সুলোচনা?"

এ কি! সুলোচনা স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? সুলোচনা তখন ঘন ঘন কম্পিত-হৃদয়ে শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—"কেন ললিত, আজ তুমি আমায় অমন কথা বল্‌ছ?"

ললিত বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কহিল,—"আজ আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গেছে, তাই প্রাণের জ্বালায় এ কথা বল্‌ছি। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই,—সুলোচনা, তুমি পরের হবে। আমি জান্‌তেম—তুমি আমার, চিরকালই আমার।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে সুলোচনা কহিল,—"কি! আমি পরের হব? এ কথা মনেও স্থান দিও না ললিত। আমি অবিশ্বাসিনী নই।"

ললিত। তবে শোন সুলোচনা। আমি পিতার মুখে শুনেছি—প্রতাপের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির হচ্ছে। তাই প্রতাপ আজ তোমায় দেখ্‌তে এসেছে। এ আসার অন্য কারণ কিছুই নাই। প্রতাপ ধনী, আমি দরিদ্র। তাই তুমি আমার সম্মুখে তাহার প্রণয়-উপহার গ্রহণ করলে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সুলোচনা যে একেবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। সুলোচনা তৎক্ষণাৎ বলিল,—"সে কি! আমি তো এ বিষয়ের কিছুই জানি না।"

তার পর প্রতাপের প্রদত্ত সেই 'ভোজালী' খানি ললিতের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল,—"ঈশ্বর সাক্ষী, আমি অবিশ্বাসিনী নই। প্রতাপের উপহার তোমায় দিলাম। যদি কখনও অবিশ্বাসিনী হই, তবে এই অস্ত্র আমার ন্যায় অবিশ্বাসিনীর হৃদয় মধ্যে তুমি প্রবেশ করাইয়া দিও।"

ললিত শিহরিয়া উঠিল! এই সময় বাহিরে কি একটা শব্দ হইল। ললিত তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল—দর জার পার্শ্বে অমরনাথের ক্রোধদীপ্ত মূর্ত্তি! কি সর্ব্বনাশ! অমরনাথ তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়াছেন নাকি? ভয়ে, লজ্জায়, ললিত মরমে মরিয়া গেল, এবং দ্রুতপদে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে অমরনাথের গম্ভীর মূর্ত্তির সম্মুখে উপাধ্যায় সদানন্দ বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরব—বিষয় গুরুতর। অনেকক্ষণ পরে অমরনাথ কহিলেন,—"অসম্ভব! তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ—অসম্ভব! আমি দুগ্ধ দিয়া এত কাল কালসাপ পুষে আস্‌ছি। এখন তার দংশনের জ্বালা—অসহ্য! অসহ্য!"

সদানন্দের চির-আনন্দময় হৃদয়ে আজ একটা নিরানন্দের প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। সদানন্দ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"বিবাহ দেওয়া-না

দেওয়া সে আপনার ইচ্ছা, তবে এ কথাটা, আপনার কন্যার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে বল্‌ছেন কি ?”

অমর। নিশ্চয়। কন্যার ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার হৃদয় বড় ব্যথিত হয়েছে বলেই, আমি এ বিবাহে অসম্মত।

সদানন্দ। অমঙ্গল আশঙ্কাটা কি ?

অমর। তোমার পুত্র আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র নয়। এরূপ অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা অর্পণ করা অপেক্ষা অমঙ্গল আর কি হতে পারে ?

সদানন্দ। এ সম্বন্ধে আমার আর কোনও কথাই নাই। সকলই সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা। এখন আমার প্রতি কি অনুমতি হয় ?

অমর। তোমার পুত্র কোথায় ?

সদানন্দ। আপনি তাহাকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিতে বলে ছিলেন, আমি তাকে কলিকাতায় পাঠিয়েদিয়েছি। ধনই পৃথিবীর সার বস্তু জেনে, সে ধনোপার্জ্জনের জন্যে কলিকাতায় গিয়েছে। আপনার কন্যার বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রেখে, তার ধনবান হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে পারেন কি ?

অমরনাথের গম্ভীর মুখে এবার ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। যেন ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। ঈষৎ হাসিয়া অমরনাথ কহিলেন, —“আমার কন্যার বিবাহের প্রার্থী হওয়া তোমার দুই এক হাজার ধনের কর্ম্ম নয়। তুমি সাত পুরুষ ধরে চেষ্টা কর্‌লে সেরূপ ধনবান হতে পার্‌বে না। আমি কতকাল অপেক্ষা কর্‌বো ?”

সদানন্দ আর কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে বিষণ্নমনে, সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। এমন সময় ডাক-হরকরা আসিয়া অমরনাথের হস্তে কয়েকখানি চিঠি দিয়া গেল। তার মধ্যে একখানির শিরোনামায় লিখিত ছিল— “শ্রীমতী সুলোচনা ঘোষ।”

এ কাহার হস্তাক্ষর ? অমরনাথ অনেকক্ষণ উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া চিঠখানি দেখিলেন। কলিকাতায় পোষ্ট অফিস হইতে আসিয়াছে নয় ? মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অমরনাথ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—“সুলোচনা।”

অল্পক্ষণ পরেই সেই ক্রোধ প্রজ্বলিত পিতার মুখের সম্মুখে আপনার শুষ্ক—অতি শুষ্ক মুখখানি স্থাপিত করিয়া, সুলোচনা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল—“কি বাবা ?”

ক্রোধে অমরনাথের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল। সুতরাং কন্যার সেই শুষ্ক মুখ এবং ক্ষীণকণ্ঠের প্রতি তাঁহার কোনও লক্ষ্যই নাই। ক্রোধভরে অমরনাথ কহিলেন—“আমার সম্মুখে এই চিঠি খুলে চেঁচিয়ে পড়্‌।”

ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে উচ্চারিত পিতার উপরোক্ত কথা শুনিয়া সুলোচনার প্রাণ উড়িয়া গেল! পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যে কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে সেই চিঠি খুলিল। কিন্তু চিঠি পড়িতে পারিল না। তখন অমরনাথ চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া দেখিলেন— চিঠির নিম্নে স্বাক্ষর রহিয়াছে—“তোমারই হতভাগ্য, ললিত।” চিঠির আরম্ভে দেখিলেন—“প্রিয়তমে, তোমার পত্র পাইয়াছি।” ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে অমরনাথ সে পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল না। অগ্নি জ্বালিয়া সেই ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি পোড়াইলেন। পত্রখণ্ড দগ্ধ করিয়া আগুন নিবিল। কিন্তু অমরনাথের ক্রোধাগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত

হইল না। তখন কন্যাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। সেই দিন হইতে গোপনে পত্র লেখালেখিও বন্ধ হইয়া গেল। পিতৃসকাশ হইতে ক্ষুব্ধ ভগ্নহৃদয় লইয়া, সুলোচনা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর শরণাগত হইল। জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া সুলোচনা অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত প্রাণের কথা খুলিয়া বলিল। সুলোচনার জননীর নাম—মনোরমা। মনোরমা কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। সাদরে মুখ চুম্বন করিয়া, প্রবোধবাক্যে বলিলেন,—"মা, ছেলেবেলায় অমন কত ভালবাসাবাসি হয়। আমরা তোমার ভালর চেষ্টাই করছি। তোমায় রাজরাণী কর্‌বো। এখন একটু কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু পরে সুখ হবে মা। তখন এ সকল কথা সব ভুলে যাবি।"

সুলোচনার শেষ আশা ফুরাইল! এই কি সুলোচনার জননীর সান্ত্বনাবাক্য? হা অদৃষ্ট!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশা ফুরাইয়া গিয়াছে। এইবার বুঝি সুলোচনার জীবনও ফুরাইয়া যায়। আজ অষ্টাহ হইল—সুলোচনার ভয়ঙ্কর জ্বর হইয়াছে। সে জ্বর, এখন বিকারে দাঁড়াইয়াছে। বিকারে অচৈতন্য অবস্থায়, সুলোচনা কত ভুল বকিতেছে। কিন্তু সে ভুল, ভুল নহে। সে কেবল—সেই ললিতেরই কথা। অমরনাথ কলিকাতা হইতে বড় বড় ডাক্তার আনাইয়াছেন, কিন্তু কেহই জীবনের আশা দেন নাই। সুতরাং অমরনাথ ও মনোরমার মনের সেই শোচনীয় অবস্থা, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দুই প্রহরের পর সুলোচনার জ্বরের প্রকোপ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমেই গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সেই ঘর্মের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুলোচনা তখন কুল কুল করিয়া ঘামিতেছিল। নিকটে বসিয়া দুরু দুরু হৃদয়ে—কম্পিতহস্তে মনোরমা সেই ঘাম মুছাইতেছিল। ডাক্তার আসিলেন—সে অবস্থায় যথাবিধি ব্যবস্থাও করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমেই হিমাঙ্গ। আজ আট দিন পরে এই হিমাঙ্গ অবস্থায় সুলোচনা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সেই পাণ্ডুবর্ণ ক্ষুদ্র অধর ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সুলোচনা কহিল—"মা—তবে আসি মা।"

বাষ্পগদগদ কণ্ঠে মনোরমা কহিল—"কোথায় যাবি মা?"

পুনরায় সেই কাতর কণ্ঠের অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হইল—"রাজরাণী হতে যাব মা—জন্মের মত যাব মা—কিন্তু যাবার সময় একবার দেখাও, আমি জন্মের শোধ দেখ্‌বো মা, আমায় একটিবার দেখাও?"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, মনোরমা কহিল—"কি দেখ্‌বে মা? কাকে দেখ্‌বে মা?"

"ল—লি—ত—মো—" কথা শেষ হইতে না হইতেই সুলোচনার জীবন-নাটকের যবনিকা পতন হইল। আশা মিটিল। সব ফুরাইল!

যথাসময়ে সে সংবাদ সবিস্তারে ললিতমোহনের নিকট পৌঁছিল। এই আকস্মিক বিপদের সংবাদে ললিতের মূর্ত্তি—নির্ব্বাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় ধীর, স্থির ও গম্ভীর! ললিতের হৃদয় মধ্যে তখন কোন প্রবল ঝড় বহিতেছিল কি

না জানি না; কিন্তু বাহ্য আকারে তাহার কোনও চিহ্নই লক্ষিত হইল না। কিছুক্ষণ এই ভাবেই গেল। তার পর ক্যাড়াজড়ি কোথা হইতে ললিতমোহন সুলোচনা-প্রদত্ত সেই তীক্ষ্ণধার শাণিত ভোজালি বাহির করিল।

কি কর ললিতমোহন—কি কর! আবার কি করিবে? মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া, ললিতমোহন, সেই অস্ত্র আপন হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ললিতমোহনের রক্তাক্ত দেহ ভূমিতে লুটাইল। সে দিন রবিবার—ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের মতে সেই বিশ্রামের দিনে, ললিতের যন্ত্রণাময় জীবন, চির-বিশ্রাম লাভ করিল।

তারযোগে সেইদিনই প্রতাপপুরে সদা-নন্দের নিকট এই শোকাবহ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। সে সংবাদ যে শুনিল, তাহারই শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই; সাশ্রুনয়নে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নরনারীগণ, যথা-সময়ে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সেই কন্যাশোক-কাতর অমরনাথ ও মনোরমাও ছিলেন। বেদীর উপর আসীন—সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র-শোককাতর উপাচার্য্য সদানন্দ। উপা-চার্য্যের আজিকার বক্তৃতার বিষয়—'প্রেমের জয়।' এই শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়া, উপাচার্য্য, সমবেত নরনারীকে প্রেমের জয় বার্ত্তা বুঝাইলেন। উপদেশ-ছলে শেষে তিনি আলঙ্কারিক ভাষায় কহিলেন:—

"একটি পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে একটি প্রস্রবণ আসিয়া নিম্ন শৃঙ্গের অন্য একটি প্রস্রবণের সহিত মিলিত হইয়াছিল। সেই মিলনের ফলে, একটি আনন্দ নদী প্রবাহিত হয়। নদী আনন্দে লহরীর উপর লহরী তুলিয়া এক অনন্ত আনন্দসাগরে মিলিতে চলিয়াছিল। নদীতীরে আনন্দ কানন। ফুল-পুষ্প শোভিত বৃক্ষে নদী-সৈকত সুশোভিত। কিন্তু উচ্চ প্রস্রবণের সহিত নিম্ন প্রস্রবণের মিলন—একজনের প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি দুইটি প্রস্র-বণের মুখ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন কাজেই আনন্দ নদী শুকাইল। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মে—সেই প্রস্রবণের মুখ বন্ধ থাকিতে পারে না। অবরুদ্ধ প্রস্রবণদ্বয় তখন অপর দিক দিয়া ভীষণ বেগে ছুটিল। অন্যপথে আবার দুইটি মিলিল। আবার তাহারা লহরের উপর লহর তুলিয়া অন্য পথে সেই অনন্ত আনন্দসাগরে বিলীন হইয়া গেল। প্রেমেরই জয় হইল!"

উপাচার্য্যের বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত নরনারী সকলেরই হৃদয় শোকে আকুল হইল। অবিশ্রান্ত অশ্রু মোচন করিতে করিতে সকলেই গৃহে ফিরিল। আর কন্যাশোকে অধীর অমরনাথ ও মনোরমার ভগ্ন হৃদয়, সেই প্রেমের ব্যাখ্যানে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! দেখিতে দেখিতে এক একে তাঁহারাও সুখ, সম্পদ, ধন, ঐশ্বর্য্য ও মানসম্ভ্রমের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সব চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজও প্রতাপপুরের অমরনাথের সেই ভগ্ন প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে। আর সেই ভগ্নস্তূপের উপর স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত একখানি প্রস্তর-ফলক আজও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সে প্রস্তর ফলকে আজও লিখিত আছে—'**প্রেমের জয়!**'

সমাজ-চিত্র।

বালবিধবার সুখ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন জ্যৈষ্ঠমাসের বৈকালবেলায় একটি বালক এক বালিকাকে পাঠাভ্যাস করাইতেছিল। বালক অতি যত্নের সহিত তাহাকে পাঠ বুঝাইয়া দিতেছিল, বালিকাও আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতেছিল। বালিকার ভ্রমরগঞ্জিত আ-চরণ-বিলম্বিত সুদীর্ঘ সুচিক্কণ কেশরাশি উড়িয়া উড়িয়া বালকের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িতেছিল। তাহাতে একরূপ অপূর্ব্ব শোভাও হইতেছিল। কিন্তু সে শোভা দেখিতে নিকটে কেহ ছিল না। বালক যেন কিছু আত্ম-বিস্মৃত—যেন সংসারের অন্য সকল প্রিয় বস্তুর কথা এখন আর তাহার স্মরণ নাই—এক মনে—এক প্রাণে বালিকাকে পড়াইতেছে। একটি বালিকাকে পাঠাভ্যাস করাইয়া বালক এমন কি বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, আমরা কিন্তু ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

বালকের বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর। নাম মন্মথ, দেখিতেও সুশ্রী বটে—কিন্তু তা বলিয়া স্বয়ং কামদেব নহে। বালিকার বয়ঃক্রম অষ্টম বৎসর মাত্র। দেখিতেও সুন্দরী, তবে এখন যেন একটি গোলাপ-কলিকা। আরো বালিকার মুখখানিতে যে সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ ভুবন-ভুলান, মুগ্ধকর ছবি দেখা যাইতেছিল, তাহা কোন জাতীয় প্রস্ফুটিত গোলাপেও নাই। বালিকার নাম—সরলা।

সরলা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক মাত্র কন্যা। সরলার মাতার বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর, তখন কাশীনাথের এই কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হয়। তার পর এই আট বৎসরের মধ্যে কাশীনাথের আর কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই, সুতরাং সরলা কাশীনাথের জীবনসর্ব্বস্ব। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। সুতরাং পাশ্চাত্যসভ্যতা আজও তাঁহার হৃদয় আলোকিত করে নাই; কারণ, তিনি ইংরাজী বর্ণমালা পর্য্যন্ত জানিতেন না; কিন্তু তাহাতে সমাজে তাঁহার সম্মানের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তাঁহার ৩।৪ খানি জমীদারীর আয়ও যথেষ্ট ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম্ম, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির উপর কাশীনাথের আজন্ম বিদ্বেষ, কিন্তু কন্যাকে লেখাপড়া না শিখাইলে উত্তম পাত্র মিলিবে না বলিয়া, গৃহিণী অনুরোধ করায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগত্যা তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। গ্রামে (গ্রামের নাম বিজয়-পুর) একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তথায় কন্যাকে না পাঠাইয়া গৃহে যে সচ্চরিত্র দরিদ্র বালক প্রতিপালিত হইতেছিল,

তাহাকেই শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই দরিদ্র বালকই মন্মথ।

অতি শৈশব অবস্থায় মন্মথ পিতৃমাতৃহীন হয়; পিতা মাতার মৃত্যুর পর, এক পিতৃষ্বসা ভিন্ন এ জগতে তাহার আর কেহ ছিল না। তিনিও একদিন পঞ্চম বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছু দিনের জন্তে কাশীনাথের গৃহিণীর নিকট রাখিয়া শ্রীক্ষেত্র চলিয়া যান, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসেন নাই, এবং কেন যে ফিরিয়া আসেন নাই, তাহার কোন সন্ধানও পাওয়া যায় নাই। তিন বৎসর কাল কাশীনাথ ও তাঁহার গৃহিণী পুত্রনির্ব্বিশেষে মন্মথকে প্রতিপালন করিতেছিলেন। তখন গ্রামস্থ সকলে ভাবিল—ভবিষ্যতে মন্মথই তাঁহাদের সমস্ত বিষয়ের উত্তাধিকারী হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় শেষ বয়সে ব্রাহ্মণের এক কন্যা জন্মিল। কন্যা জন্মাইবার পর অবধি, কাশীনাথ কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর মন্মথের প্রতি আর ততদূর স্নেহ রহিল না, কিন্তু তথাপি তাঁহারা বালকের চরিত্রগুণে মোহিত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন।

মন্মথ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, সরলাকে যত্নের সহিত পড়াইত। সরলাও সর্ব্বদা মন্মথের নিকটে থাকিতে ভালবাসিত। কোন উত্তম খাদ্যদ্রব্য পাইলে দৌড়িয়া তাহার নিকটে আসিত এবং তাহাকে অগ্রে না খাওয়াইয়া নিজে কোন ক্রমেই খাইত না। এইরূপে অষ্টম বৎসরের বালিকার সহিত ষোড়শ বৎসরের বালকের একরূপ ভালবাসা জন্মিল—প্রণয় বলিতে হয়, তোমরা বল, কিন্তু আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, প্রণয় যে কি পদার্থ উভয়ের কেহই (অন্ততঃ বালিকা) তখন কিছুই জানিত না।

পাঠ শেষ হইলে বালক একবার সতৃষ্ণনয়নে বালিকার সেই ক্ষুদ্র মুখখানির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিল। বালিকা তাহা দেখিয়া গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া বালিকাসুলভ হাসি হাসিল। হাসিবার সময় কেবল গাল দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। মুখশ্রী অন্য কোন বিভীষিকামূর্ত্তি ধারণ করিল না। সে হাসির লহরী বালকের হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল—বালকের আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল—"সরলা, শীঘ্র আয়, তো'র বিয়ের জন্তে কে তোকে দেখ্‌তে এসেছে।"

সে কথা বালকের কর্ণে গেল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন কি টানিয়া ছিঁড়িতেছে বলিয়া বোধ হইল—বুকের ভিতরে যেন একটা ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। একবার শূন্যমনে বালিকার মুখপানে চাহিল। দেখিল—সরলা বালিকা সেইরূপ মধুর হাসি হাসিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে একদিকে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল! এই হাসিও ক্ষণপ্রভার ক্ষণদীপ্তির ন্যায় দেখিতে অতি সুন্দর, সুতরাং ফলও তদ্রূপ—মন্মথের হৃদয়ে একবারে বজ্রাঘাত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে। আজ ২২শে আষাঢ় বুধবার—সরলার বিবাহ। কাশীনাথের গৃহে আজ আর আনন্দ ধরে না। একজন ব্যতীত সমস্ত বিজয়পুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ আনন্দ ও উৎসবে মগ্ন। বলা অনাবশ্যক, সে একজন কাশীনাথেরই প্রতিপালিত দরিদ্র বালক মন্মথ। গ্রামস্থ

বিবাহের ন্যায় কোন কথাই তাহার স্মরণ নাই। যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল, এক শুভদৃষ্টি ভিন্ন এখন পর্য্যন্ত সরলা তাহাকে ভাল করিয়া দেখে নাই, সুতরাং তাহার কথা সরলার আর মনে থাকিবে কি?

একদিন বৈকালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকজন প্রতিবাসীর সহিত বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় একজন ডাক-হরকরা একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানি তিনি পড়িয়া দেখিলেন—এক ভয়ানক অশুভ সংবাদ—জামাতার বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে! এই সংবাদে তিনি একবারে শোকে অধীর হইলেন। প্রতিবাসীরাও সকলে দুঃখিত হইলেন। পাঠকেরাও এ সংবাদে দুঃখিত হইবেন, কিন্তু আমরা কি করিব? যাহা ঘটিয়াছে, আমাদের সকল কথাই সত্য লিখিতে হইবে। আর সরলার অদৃষ্টের উপর আমাদের ত কোন হাত নাই!

ক্রমে ক্রমে সে সংবাদ অন্তঃপুরে গিয়া পৌঁছিল! সরলার মাতা একবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, এবং অন্তঃপুর হইতে এক ভয়ানক হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। সে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইলে অনেক প্রতিবাসিনীও আসিয়া জুটিল। সরলা নিকটেই এক সমবয়স্কা বালিকার সহিত খেলা করিতেছিল। জননীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে গেল। আর খেলা হইল না—সে এক দৌড়ে বাড়ীতে আসিল। বাড়ীতে আসিবামাত্র তাহাকে দেখিয়া সকলে আরো উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সরলাও এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কেন কাঁদিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। একজন সরলাকে সান্ত্বনা বলিল—"চুপ কর্ মা, কি করবি বল্? এই বয়সেই তোর কপাল পুড়েছে।"

কপাল পুড়িয়াছে! বজ্রধ্বনির ন্যায় তাহা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার কর্ণে গিয়া বাজিল! কি জানি—কি ভাবিয়া সরলার হস্ত হঠাৎ তৎক্ষণাৎ আপনার কপাল স্পর্শ করিল। কিন্তু তাহাতেও সে নিদারুণ কথার অর্থ বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিল না, সুতরাং অবাক্ হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি ভাবিয়া সরলা এই সময়ে একবার তাহার ব্যথার ব্যথী দুঃখের দুঃখী মন্মথ-দাদার নিকটে দৌড়িয়া গেল। দেখিল—এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া নীরবে তাহার দাদাও রোদন করিতেছে। তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সরলা বুঝিল,—তাহার কপাল নিশ্চয় পুড়িয়াছে, তাহা না হইলে তাহার দাদাও কাঁদিবে কেন? বলিল—"দাদা, তবে যথার্থই কি আমার কপাল পুড়িয়াছে?"

সরলার স্বর অস্ফুট,—করুণরসোদ্দীপক ও মর্ম্মস্পর্শী! সুতরাং তাহা শুনিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। সে স্বর দাদার হৃদয়ে গিয়া বাজিল, হৃদয় বিদীর্ণ হইল, স্ত্রীলোকের ন্যায় মন্মথও উচ্চৈঃস্বরে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে নিদারুণ কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না।

সরলার মাথা ঘুড়িয়া গেল। সে ক্ষুদ্র হৃদয় আর কত সহ্য করিবে? বালিকা তাহার দাদার কোলে শুইয়া পড়িল। কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দাদাও অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল; সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"সরলা, তোমার কপাল পোড়ে নাই; প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি—তুমি যাতে সুখী হও, আমি তাই কর্‌বো।"

কথা সরলার কাণে গেল, হৃদয় স্থির হইল। সরলা দুই হস্তে চক্ষের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হইল। এক দৃষ্টে তাহার দাদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল —"তবে আর কাঁদ্‌বো না। আমি খেলা করি গে?"

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সরলা চলিয়া গেল। যুবা একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল। সরলা চলিয়া গেলে পাশ্চত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বিকৃতিবুদ্ধি যুবা সরলার ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা একবার ভাবিল—বাঙ্গালীর বাল-বিধবার উপর সামাজিক অত্যাচারের কথা মনে পড়িল—হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর যেন জ্বালা করিতে লাগিল! যুবা আবার কাঁদিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নদীর স্রোতের ন্যায় জীবনস্রোত ক্রমাগত বহিয়া চলে। কোন্ বাধা মানে না, কাহার মুখোপানে চায় না, কেবল আপন মনে চলিয়া যায়। এইরূপে সরলার জীবনেরও পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল। কাহাকে কাঁদিতে দেখিলে সরলা কাঁদিত, নতুবা সর্ব্বদাই সেই ক্ষুদ্র মুখখানি হাস্যময়। নিজের প্রকৃত অবস্থার বিষয় কিছুই বুঝিত না, এবং বুঝিবার চেষ্টাও করিত না। সরলার এই অজ্ঞান অবস্থায় মন্মথ কতক পরিমাণে সুখী ছিল; কিন্তু সময়ে সময়ে গোপনে সরলার জন্যে কাঁদিত। সরলার বালিকাবস্থা বলিয়া এখনও তাহাকে পূর্ণমাত্রায় বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরলার স্নেহময়ী জননী এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সরলা বিধবা হইয়াও অলঙ্কার পরে, একাদশীর দিন জল খায়, আবার দুইবেলা আহার করে—এই সকল দেখিয়া অনেক স্ত্রীলোকের তাহা অসহ্য হইল। সময়ে সময়ে তাহাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিত। একদিন প্রাতঃকালে পুষ্করিণীর ঘাটে সরলার কথা উঠিল। তথায় সরলা সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল:—

কুমুদিনী বলিল—"হ'ক বড় মানুষের মেয়ে, তা, বলে কি ইহকাল পরকাল নাই, এখনও রাত দিন হয়। সরলার ভাই, এরূপ করা ভাল দেখায় না।"

কাদম্বিনী বলিল—"সত্য বল্‌তে কি ভাই, আমার সরলার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হয়।"

বিনোদিনী বলিল—"ছুঁড়িটে আবার কেমন ফিক্ ফিক্ করে হাসে দেখেছ?—এ দশায়, অত হাসি ভাল নয়।"

সুশীলা বলিল—"আবার একটা ছোঁড়াও বাড়ীতে জুটেছে।"

নৃত্যকালী বলিল—"চুপ কর ভাই, আমাদের ও কথায় কাজ কি? সরলার মা শুন্‌লে মনে দুঃখ কর্‌বে।"

তখন কুমুদিনী আবার বলিল—"মনে দুঃখ কর্‌লে কি হ'বে? এর পর গ্রামে যখন টি টি হ'বে, তখন কি আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে? এই বেলায় সাবধান হ'ক।"

সরলা সেই পুষ্করিণীতে আসিতেছিল, তাহার বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে শুনিয়া গোপনে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিল। ঘাটে আর আসা হইল না, ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। একখানি থান কাপড় পরিয়া সরলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সে কান্না সরলার জননী

কাণে গেল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সরলার নিকট আসিলেন। আর একজন যুবক যে কান্না শুনিয়া অন্দরে সরলা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে বসিল। সরলার জননী সরলাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি গহনা খুলো না, আমরা বেঁচে থাকুতে তোমার ও দশা দেখ্‌তে পারবো না।"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"মা, আমি বিধবা। বিধবাকে ত গহনা পর্‌তে নাই।"

সরলার কথা জননীর হৃদয়ে যেন শেল বিঁধিল। তাহার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। অশ্রুজলে সে জ্বালার কিছু উপশম হইলে পুনরায় বলিলেন—"তুমি ছেলেমানুষ। এখন গহনা পর্‌লে কেহ তোমার নিন্দা কর্‌বে না।"

সরলা। না মা, আমি আর গহনা পর্‌ব না। আজ হতে তোমার সরলা এক-সন্ধ্যা হবিষ্যি কর্‌বে—একাদশীর দিন একাদশী কর্‌বে। আজ হতে সে তাহার সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিল। আজ হতে তুমি আর তাকে ভালবেসো না, পিতাকে বলো—আত্মীয় স্বজন সকলকে বলো—আজ হতে কেহ যেন সরলাকে আর আদর না করে।

সরলার মা। সরলা, তুমি বালিকা, এত কষ্ট সইবে কি করে মা?

সরলা। এখন আর আমি বালিকা নই, এতদিন বালিকা ছিলাম—বুঝ্‌তে পারি নাই। কষ্ট সহ্য করবার জন্যই আমার জন্ম যে মা! আমার জীবনে আর কি হবে মা?

এই সময় সরলার পিতা কাশীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন—"সরলা বারো বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এখন তার জ্ঞান হয়েছে। পরকালের কাজ কর্‌তে দাও, তাতে কোন বাধা দিও না। বাধা দিলে আমাদের অধর্ম্ম হবে।"

এই কথা বলিয়া ফিরিয়া যাইবার সময়, একবার সরলার প্রতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িল। তৎক্ষণাৎ চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। মনে মনে বলিলেন, "দীনবন্ধো, প্রভো, আর কত সহিব? ইহা অপেক্ষা সরলার মৃত্যু লিখিলে না কেন?"

হা অদৃষ্ট! স্নেহময় পিতা প্রাণতুল্য, জীবনসর্ব্বস্ব, একমাত্র কন্যার মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছেন!

* * * *

বৈশাখ মাস বেলা চারিটা বাজিয়াছে। একটি দ্বাদশ বৎসরের বালিকা শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। নিকটে তাহারই জননী পাখাহস্তে বাতাস করিতেছেন, এবং চক্ষের জলে পরিধেয় বস্ত্র ভিজাইতেছেন। আরো চারি পাঁচটি আত্মীয়া স্ত্রীলোক শয্যার চারিধারে বসিয়া আছেন। বালিকার পিতা অদূরে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। বালিকা আর কেহ নয়, আমাদের চিরদুঃখিনী হতভাগিনী, বাল-বিধবা সরলা। সরলার কোন উৎকট রোগ হয় নাই—আজ সরলার একাদশী। ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া সরলা বলিল—"আর কত বেলা আছে মা?"

সরলার মা উত্তর করিলেন—"অধিক বেলা নাই, চারিটা বেজেছে।"

সরলা। তবে তুমি খাওনা গিয়ে মা?

সরলার মা। সরলা, এখনও তুমি মুখে জল দাও নাই, আর আমি কেমন করে খাবো মা?

সরলা, জননীকে আহার করিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। নিকটে

যাহারা ছিল, তাহারাও সকলে অনুরোধ করিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর, সরলার জননী আহার করিতে বসিলেন মাত্র, কিন্তু আহার করা হইল না—চক্ষের জলে সমস্ত অন্ন ভিজিয়া গেল!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন সরলার অবস্থা বড় মন্দ। সরলা আর কথা কহিতে পারে না, চক্ষে দেখিতেও পায় না। তৃষ্ণায় সরলার প্রাণ বুঝি বাহির হইয়া যায়। অতি ক্ষীণ স্বরে সরলা তখন বলিল—"আর বুঝি থাকতে পারলাম না, একটু জল দাও—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়, আর কিছু চাই না মা—একটু জল।"

কিন্তু জল দেবে কে? আজ একাদশীর দিনে বিধবার মুখে জল দিয়া পাপের ভাগী হইবে কে? কেহ জল দিল না,—সকলেই সে মর্ম্মান্তিক কথায় কাঁদিল!

এই সময় মন্মথ আসিয়া কাশীনাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আর এ দৃশ্য দেখা যায় না, সরলাকে একটু জল খেতে দিন্।"

কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কে বিধবার মুখে জল দিয়ে তার ধর্ম্ম নষ্ট করবে—আর নিজেও পাপের ভাগী হবে?"

মন্মথ ব্যাকুল প্রাণে কহিল—"আমি প্রস্তুত আছি।"

কাশীনাথ ক্রোধভরে কহিলেন—"তোমার কি নরকের ভয় নাই?"

সাহেবের মিশনারী স্কুলের ছাত্র সেই যুবা তখন উত্তেজিতস্বরে কহিল—"এই পাপের শাস্তির জন্য যদি অনন্তকাল নরকের কীট হয়ে আমায় থাকতে হয়, যদি অনন্তকাল জলন্ত অগ্নিতে পুড়তে হয়, কিম্বা তাহা অপেক্ষা আরো ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা যদি নরকে থাকে, সে সকল অম্লানবদনে সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, তবু এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না।"

কাশীনাথ এবার করুণস্বরে কহিলেন—"তোমরা ইংরাজী পড়েছ, তোমাদের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস নাই, কিন্তু তা বলে আমার কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করতে তোমায় দিতে পারি না।"

যু। অগ্রে তাহার জীবন রক্ষা করুন—পরে ত ধর্ম্ম।

কাশীনাথ। ধর্ম্মের জন্য আমার কন্যার মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখতে পারি, তবু একাদশীর দিন জল খেতে দিতে পারি না।

সে কথা শুনিয়া যুবক তৎক্ষণাৎ একবার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখের প্রতি চাহিল। দেখিল—তাঁহার চক্ষে অশ্রুজল, কিন্তু মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। সে দৃশ্য দেখিয়া যুবকও নীরবে কাঁদিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তার পর বিকৃতবুদ্ধি মন্মথ সরলার জন্য প্রত্যহ কাঁদিত। এই রূপে আরো কয়েক বৎসর গেল। হঠাৎ একদিন সরলার নিকট তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। তখন শোকে, ক্ষোভে, মনোবেদনায় যুবা যেন একবারে বিষের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। কি প্রকারে সরলাকে সুখী করিবে—ভাবিয়া অস্থির হইল। এতদিন তাহার জন্যে বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়া আপনাকেও মনে মনে কত ধিক্কার দিল, আর স্থির করিল—যে প্রকারে হউক, সরলার বিবাহ দিবে। কিন্তু অন্যের সহিত বিবাহ দিলে—সে নিজে কি সুখী হইবে? সেরূপ বিবাহ ত একবার হইয়াছিল, কই তাহাতে ত মন্মথ সুখী হয় নাই। তবে তাহার এখন যেন আর সে ভাব নাই, এখন সরলার সুখেই তাহার সুখ! যদি সরলা তাহাতে সুখী হয়

সেও তাহাতে সুখী হইবে। সরলাকে পাইলে মন্মথ সুখী হয় সত্য, কিন্তু সরলাকে লাভ করা যদি তাহার অদৃষ্টে না থাকে, তা' বলিয়া সরলার সুখে বাধা দিবে কেন?

একদিন বৈকালে মন্মথ সরলার জননীর নিকট বসিয়া অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সেই সময় সরলার কথা তাহার মনে পড়িল। সে এই সুযোগ ছাড়িল না, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পা জড়াইয়া বলিল —"মা, আমার একটি নিবেদন আছে—সরলার বিবাহ দিতে হবে।"

সরলার মা। না বাবা, ও কথা মুখে আন্‌তে নাই। বিধবার কি আবার বিবাহ হয়?

ম। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে, কলিকাতার একজন প্রধান পণ্ডিত তা প্রমাণ করেছেন।

সরলার মা। যদি শাস্ত্রে আছে, তবে এতদিন হয় নাই কেন? কই কোন দিন বিধবার বিবাহের কথাত শুনি নাই।

ম। কলিকাতায় অনেক বিধবার বিবাহ হয়ে গিয়েছে, আপনার সরলা ত বালিকা, তার বিবাহ দিলে কোন দোষ হবে না।

এমন সময় স্বয়ং কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"কার বিবাহের কথা হচ্ছে মন্মথ?"

কাশীনাথের মুখ দেখিয়া প্রথমে মন্মথ কিছু ভীত হইল। কারণ তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, আর রাগে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতেছিল। পরে সাহস করিয়া বলিল "আপনার হতভাগিনী কন্যা সরলার।"

কাশীনাথ একবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন—"আমার কন্যা বিধবা, যে তার বিবাহের কথা উত্থাপন করে, সে আমার পরম শত্রু, আমি তাহার মুখ দেখ্‌তে চাই না।"

মন্মথ ধীরভাবে উত্তর করিল—"আমি যদি অপরাধ করে থাকি, তবে যে কোন শাস্তি দিবেন, তা সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত আছি; কিন্তু এই অনুরোধ—দয়া, স্নেহ, মায়া, মমতা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার একমাত্র কন্যাকে চিরদুঃখিনী করবেন না।"

কাশীনাথ। ধর্ম্মের জন্য আমি সে সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি, আবশ্যক হলে ধর্ম্মের জন্য প্রাণসম একমাত্র কন্যাকেও স্বহস্তে বলি দিতে পারি, তথাপি তার বিবাহ দিয়ে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারি না।

ম। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

কাশীনাথ। যে একথা বলে, সে খ্রীষ্টান—সে ব্রাহ্ম,—হিন্দুধর্ম্মের সে কিছুই জানে না।

ম। আপনি বুদ্ধিমান, আপনি জ্ঞানী। আপনার সহিত তর্কের ক্ষমতা আমার নাই—পায়ে ধরে বল্‌ছি, সরলার বিবাহ দিন। আপনি তাহার পিতা—আপনি তাকে সুখী না করলে আর কে কর্‌বে?

কাশীনাথ। তুমি যে তার বিবাহের জন্যে অনেক দিন হতে চেষ্টা করছ—তা আমি জানি; আরো জানি—শোন মন্মথ, তুমি তার প্রার্থী! তুমি সচ্চরিত্র বলে এতকাল তোমায় কোন কথা বলি নাই, বরং সন্তানের ন্যায় লালনপালন করে আস্‌ছি। কিন্তু আমার কলঙ্কের ভয় আছে, আর তোমার বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। অদ্য—এই মুহূর্ত্তে তোমার চিরকালের জন্যে আমার গৃহ হতে বিদায় নিতে হবে।

ম। প্রস্তুত আছি, কিন্তু তা হলে কি অন্যের সহিত সরলার বিবাহ দিবেন?

কাশীনাথ। তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ'—তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

ব্রাহ্মণ ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সরলার জননী মন্মথের জন্যে অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই সে অনুরোধ রাখিলেন না। মন্মথ কাঁদিতে কাঁদিতে সরলার জননীর নিকট বিদায় লইল, তখন তিনিও কেবল কাঁদিতে লাগিলেন, কোন কথা মুখে বলিতে পারিলেন না। তার পর মন্মথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিল—"আমার পিতামাতার কথা মনে নাই, আপনাকেই পিতা বলে জানি, সে কারণ সকল কথা আপনার নিকট জোর করে বলি। যদি তাতে কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জ্জনা করবেন। আপনার ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করতে পারবো না। যেখানেই থাকি, আমি আপনারই—আপনার মন্মথ আজ জন্মের মত চল্‌লো।"

আমরা কোন বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, এই সময় কাশীনাথও অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই। মন্মথ সরলার নিকট বিদায় লইতে আর গেল না, নীরবে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বাড়ীর বাহির হইল।

মন্মথ গেল না, কিন্তু সরলা আসিল। তাহাকে যাইতে দেখিয়া সরলা পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ডাকিল। মন্মথ ফিরিয়া দেখিল—পশ্চাতে বিষাদময়ী সরলা-প্রতিমা! বলিল—"এ সময় কেন দেখা দিলে সরলা?"

সরলা। জন্মের মত চলিয়াছ, আর আমার সহিত দেখা করে যাবে না? দাদা, তুমি কি আমায় ভালবাস না?

ম। তোমায় ভালবাসি না সরলা? এ কথা তোমারই মুখে আমায় শুন্‌তে হল! কি কর্‌বো—হৃদয় দেখাবার নয়, এ ভালবাসা তোমায় জানাব কি করে? সরলা, এ ভালবাসা তোমার জেনেও কাজ নাই, আর জগতের আর কার জান্‌বারও আবশ্যক নাই। আমি যতদিন বাঁচ্‌বো, আমার শরীরের প্রতি শিরায় শিরায় প্রতি রক্ত-বিন্দুর সহিত সে ভালবাসার স্রোত নীরবে বইবে।

সরলা বালিকা অবাক্ হইয়া ঐ সকল কথা শুনিল। সকল কথা বুঝিলও না, কিন্তু বলিল—"ও কথায় আর কাজ নাই। এখন কোথায় চলেছ দাদা?"

ম। কোথায় যাবো সরলা? এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে, যার নিকট যাবো? দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাক্‌বো না।

সরলা। ঘুরে বেড়ায়ে কি কর্‌বে দাদা?

ম। কি কর্‌বো? কি কর্‌বো সরলা, তবে শোন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গিয়ে বিধবার দুঃখ সঙ্গীত গাবো। দিবা-রাত্রি চক্ষের উপর দেখেও যে বাঙ্গালী বিধবার মর্ম্মান্তিক দুঃখ আজও বুঝিল না, তাহাদের চরণ ধরে কাঁদ্‌বো। কাঁদিব আর বল্‌বো—'ভাই সকল, একবার বঙ্গের বালবিধবার মুখপানে চাও, তাহাদের যন্ত্রণার বিষয় ভেবে দেখ। আমরা অবলা-দিগের উপর এত অত্যাচার করি বলিয়াই সেই পাপে আমাদের এই হীনাবস্থা।' আরো শোন সরলা, তাতেও যদি কোন ফল না হয়, বাঙ্গালীর হৃদয় যদি এত নিষ্ঠুর—এত কঠিন হয়, অবশেষে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেবো—যে স্বদেশবাসীর হৃদয় এত নিষ্ঠুর এত নির্দ্দয়, তাহাদের মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় আলোকিত মন্মথের ব্যথিত হৃদয়ে তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না, আর ইংরাজীশিক্ষিত শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ যুবক হিন্দুশাস্ত্রকারগণের সে মহান্ উদ্দেশ্য

ছিল। তখন পুকুরের তীরস্থ একটা আম্র-বৃক্ষের ডালে বসিয়া একটা পাখী ডাকিতেছিল—"সখি, সখি, সখি, পিরীতি হউক-পিরীতি হউক।" পাখীর নাম আমাদের স্মরণ নাই, কিন্তু তাহার রব শুনিলেই সে যে উক্ত কথাই বলিতেছে তাহা স্পষ্ট বোধ হয়।

ক্রমে ক্রমে সকলেই জল লইয়া গৃহে ফিরিল, কিন্তু সেই যুবতী আর জল হইতে উঠিল না, বালিকাও তাহাকে ফেলিয়া গৃহে গেল না। তখন বালিকা ধীরে ধীরে তাহাকে বলিল—"শান্তদিদি, সকলে চলে গেল, আর তুমি ঘরে যাবে না?"

যুবতীর নাম শান্তমণি। শান্তমণি উত্তর করিল—"সকলে গেল, আর তুমি একলা দাঁড়াইয়া কেন বোন?"

"তোমার জন্যে।"

"আমি যাইব না, তুমি যাও।"

"কেন?"

"আজ এই তালপুকুরে ডুবিয়া মরিব।"

বালিকা (নিতান্ত বালিকা নয়, ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে), তখন বলিল—"বুঝিয়াছি। আচ্ছা, গাঙ্গুলী মহাশয়ের কি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই?"

"পাওয়া গিয়াছে, এইবার তাঁহার কাছে যাইব।"

"এখন কোথায় আছেন?"

শান্ত হাসিতে হাসিতে বলিল—"যমালয়ে।" কিন্তু কথাটি বলিতে শান্তর চক্ষে জল পড়িল। সে জল দেখিয়া বালিকার চক্ষেও জল আসিল। শান্ত আর স্থির থাকিতে পারিল না, জল হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বালিকার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল —অমলি, তুই আমায় এত ভালবাসিস্!"

বালিকার নাম অমলা। অমলা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"শান্ত দিদি, গাঙ্গুলী মহাশয় কি কখন তোমাদের বাড়ীতে আসেন নাই?"

শান্ত বড় দুষ্ট, আবার দুষ্টমী করিয়া বলিল—"আসিয়াছিলেন বই কি?"

"কবে?"

শান্ত চক্ষের জল মুছিয়া হাসিয়া বলিল —"কেন সেই বিবাহের রাত্রে।"

এই কথা বলিয়া শান্ত আবার হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ এবারও চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিল না। একত্রে রৌদ্র বৃষ্টির সম্মিলনের ন্যায় শান্তর এই হাসি-কান্না কেহ বুঝুক আর না বুঝুক, সেই ক্ষুদ্র বালিকাটি তাহা বুঝিয়াছিল। আপন অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া ধীরে ধীরে গৃহে লইয়া চলিল। পোড়া পাখীটা আবার অমনি ডাকিয়া উঠিল—"সখি, সখি, সখি,—পিরীতি হউক, পিরীতি হউক, পিরীতি হউক।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্ত গৃহে আসিল। অমলাও তাহার সঙ্গে আসিল—নিজের গৃহে গেল না। গৃহে আসিবামাত্র শান্তমণির কোন প্রাচীনা আত্মীয়া জল আনিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া কিছু মৃদু ভর্ৎসনা করিল। শান্তর এখন তাহাও সহ্য হইল না—সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল; কিন্তু কাহাকে কোন কথা না বলিয়া দুষ্টমী করিয়া উচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই পড়াতে জলপূর্ণ মৃন্ময় কলসীও ভাঙ্গিয়া গেল। শান্ত তখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার সুযোগ পাইল, পায়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে—এই ভাণ করিয়া শান্ত কাঁদিতে বসিল। কিন্তু আমরা অমলার নিকট গোপনে শুনিয়াছি —শান্তের পায়ে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া

সে কাঁদে নাই, আজ তাহার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সেই আঘাতের বেদনাতেই সে কাঁদিতে বসিল। কেবল অমলা সেই কথা জানিত, তাই সে তখন সহসা শান্তর কোন শুশ্রূষা না করিয়া কেবল নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, জল আনিতে গিয়া শান্তর হৃদয়ে আবার আঘাত লাগিল কোথা হইতে? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে শান্তর আজিকার জল আনিবার কালীন অবস্থার বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব। প্রথমতঃ, শান্ত কুলীন-কন্যা, এখন পূর্ণযৌবনা হইলেও সে স্বামীমুখ দেখিতে পায় না; দ্বিতীয়তঃ, সে যখন জল আনিতে যায়, তখন রাস্তায় বসন্তানিল ও তাহার সহচর কাল একটা কোকিল বড় জ্বালাতন করিয়াছিল; তৃতীয়তঃ, তালপুকুরের ঘাটে সখীগণের নিজ নিজ স্বামীর কথা লইয়া রসালাপ। তোমরা পাঁচজন রসবতীতে বিচার করিয়া বল দেখি, বিরহিণীর প্রাণে সে সকল রসালাপ কখন ভাল লাগে কি? চতুর্থতঃ, আবার একটা পাখী গোপনে থাকিয়া বিরহিণীর বিরহোদ্দীপক পিরীতি গান গাহিয়াছিল। এই এত গুলি ঘটনা একত্রিত হইয়া বিরহিণীর কোমল হৃদয়ে আঘাত করিতে পারে না কি? সুতরাং শান্তকে আমরা দোষ দিতে পারি না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অমলা ধীরে ধীরে শান্তকে বলিল—"শান্ত দিদি, চুপ কর ভাই—কেঁদে কি হবে? তোমায় যেমন কাঁদাচ্ছেন, তার প্রতিফল অবশ্যই তিনি পাবেন। তোমাকে কষ্ট দিয়া কখনই তিনি সুখী হবেন না।"

এ কথায় শান্তর বড় রাগ হইল। রাগে গর্ গর্ করিয়া শান্ত বলিল—"অম্লি, পোড়ার মুখী, তুই আমার সম্মুখে আমার স্বামীকে গালি দিলি! আমি আমার অদৃষ্টে কষ্ট পাই বলিয়া তিনি সুখী হবেন না কেন লা?"

"মাপ কর দিদি। তুমি গাঙ্গুলি মহাশয়কে যে এত দূর ভালবাস, তাহা আমি জানি না।"

এই কথা বলিতে বলিতে সরলা অমলার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শান্ত তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চক্ষু মুছিয়া দিয়া বলিল—"রাগ কর না দিদি। আমি যে জ্বালা ভোগ করি, তাতে আমার মন ঠিক থাকে না। যখন যা মুখে আসে তখনই তাই বলি। আয় ভাই, একটি কথা বলি—যিনি আমার স্বামী, যিনি, আমার ইহকাল পরকালের মুক্তিদাতা, তিনি সৎ হউন, আর অসৎ হউন, দয়ালু হউন, আর নিষ্ঠুর হউন—আমার পক্ষে তিনি দেবতা, তাঁহার নিন্দা কি ভাই, সহ করা যায়? পূর্ব্বজন্মে বোধ হয়, কত মহা পাপ করিয়াছিলাম, হয়ত কাহার স্বামী-সুখে বাধা দিয়াছিলাম—তাই এ জন্মে আমার এই দুর্দ্দশা। তুমি ভাই বালিকা, আজও তোমার বিবাহ হয় নাই। ভালবাসার কথা তুমি কি করিয়া বুঝিবে?"

"আচ্ছা শান্ত দিদি, ভাল বাসিলে তবে ত ভালবাসা জন্মায়; আমাদের গাঙ্গুলি মহাশয় কি তোমায় ভাল বাসেন?"

"তিনি নাই বা ভাল বাসিলেন। তিনি যখন আমায় বিবাহ করিয়াছেন, তখন আমি ত তাঁহার দাসী। আর তাঁহারই বা দোষ কি? তিনি কুলীন, একশটা বিবাহ করিতে পারেন, তা বলিয়া এক শত জন স্ত্রীকে ভাল বাসিতে পারেন না।"

"আমি ভাবিতাম, ভালবাসিলে তবে

ভালবাসা হয়, বিবাহ করিলে যে ভালবাসা জন্মায়, তাহা জানিতাম না। আচ্ছা দিদি, বিবাহের পূর্ব্বে যদি কেহ কাহাকে ভাল বাসে, আর যদি তার সঙ্গে বিবাহ না হয়ে অন্য কাহার সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে যাহার সঙ্গে বিবাহ হয়, তাঁকে কি সে ভালবাসিতে পারে?"

অমলার এই কথা শুনিয়া শান্ত যেন চমকিয়া উঠিল! কি যেন হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল; একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমলার দিকে চাহিল। অমলা কিছু অপ্রতিভ হইয়া অবনত মস্তকে আপনার মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শান্ত আর স্থির থাকিতে পারিল না; অমলার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া বলিল—"অম্লি, পোড়ার মুখী—তুই এই বয়সেই মরিয়াছিস্! কাহাকে ভাল বাসিস্, সত্য করে বল্, তা না বলিলে এখনি এই চুল ধরিয়া এক আছাড় মারিব।"

শান্ত বড় দুষ্ট। সে যাহাকে ভালবাসে, তাহার দোষ দেখিলে তাহাকে গালি না দিয়া—বা প্রহার না করিয়া থাকিতে পারে না। বিনা দোষে অন্য কেহ যদি শান্তকে গালি দেয়, কিম্বা প্রহার করে, শান্ত নিঃশব্দে তাহা সহ্য করে, কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে না। আবার তাহার দোষ দেখিয়া তাহার কোন সখী যদি তাহাকে ভৎর্সনা কিম্বা প্রহার না করে, তবে শান্তর অভিমানের আর সীমা থাকে না।

অমলা কোন কথা কহিল না, অবনত-মুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কি, জানি কেন অমলার অশ্রুজলে সেই খান-কার মাটি ভিজিতে লাগিল। অমলার চক্ষে জল দেখিয়া শান্তর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার মস্তক আপন বক্ষে রাখিয়া শান্ত প্রথমে অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে অমলার কান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল দেখিয়া শান্ত নিজেও কাঁদিতে বসিল। হাসি আর কান্না শান্তর আয়ত্তা-ধীন, সুতরাং তাহার জন্যে তাহাকে আর বেশী চেষ্টা করিতে হয় নাই।

অনেকক্ষণ এইরূপে দুইজনে পরস্পর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অমলা সে কান্নায় কত সুখোপভোগ করিতে লাগিল। পরে একটু সুস্থির হইলে অতি গোপনে উভয়ের অনেক কথা হইল। কিন্তু সে সকল গোপনীয় কথা তোমাদের এখন জানিবার আবশ্যক নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তর নিকট হইতে অমলা গৃহে ফিরিয়া আসিল। এইবার আমরা অম-লার পরিচয় দিব। অমলা সুধারাম চট্টো-পাধ্যায়ের কন্যা, সুধারামের এই কন্যা ব্যতীত আরো দুইটী পুত্র আছে। কিন্তু তাহারা বিদেশে কর্ম্ম করিত, সুতরাং সস্ত্রীক, বিদেশেই থাকিত। পুত্রেরা পিতাকে নিয়মিতরূপ সংসারখরচ পাঠাইয়া দিত না; কারণ, পুত্রবধূরা কখনই সে সংসারে থাকিত না; তবে অনেক অনু-নয় বিনয় করিলে মাসিক ২০৲ টাকা খরচের স্থানে কখন কখন ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিত। সুধারামের অন্য কোনরূপ আয় ছিল না, পুত্রদিগের নিকট হইতে কখন কখন যে সাহায্য পাইতেন, তাহা-তেই অতিকষ্টে কোনরূপে সংসারখরচ নির্ব্বাহ হইত। কন্যা ব্যতীত সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও এক ভগিনী ছিল। প্রতি-বাসীদিগের সহিত সুধারামের বিলক্ষণ

প্রণয় ছিল, বিশেষতঃ শান্তর পিতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিশেষ আত্মীয়। ইনি আবার কিরূপ সম্পর্কে ভাই হইতেন। এই সকল প্রতিবাসীরাও অনেক সময় তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। সুধারামের অবস্থা মন্দ হইলেও তিনি কন্যাটিকে অতি যত্নের সহিত লালনপালন এবং যথেষ্ট স্নেহও করিতেন। এতদিন সুধারামের বিশেষ কোন দায় ছিল না, কিন্তু সংপ্রতি কন্যাটি বয়ঃস্থা হওয়ায়, সুধারামের একটি দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে যে ব্যয়, তাহা তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি পুত্রদ্বয়কে এই বিষয়ে বারংবার পত্র লিখিয়াছিলন, কিন্তু তাহারা যাহা সাহায্য করিতে চায়, তাহাতে এ কালে কন্যা-বিবাহের ব্যয় কোনক্রমেই কুলান হয় না!

অমলার বয়স যখন চারি বৎসর, তখন হইতে একটি সম্বন্ধ স্থির ছিল। ঐ গ্রামের বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজয় নামে একটি পুত্র ছিল। বিজয় সর্ব্বাংশে অমলার উপযুক্ত পাত্র; কিন্তু বিজয়ের পিতা কিছু সঙ্গতিপন্ন, এবং কুলীন বলিয়া পরিচয়ও দিতেন, সুতরাং পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে একখানি নূতন জমিদারী ক্রয় করিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে মনঃস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অমলার পিতার এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে, বিজয়ের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন, সুতরাং পাত্র মনোনীত হইলেও অর্থের অনাটনে উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতে তিনি অক্ষম হইলেন! পূর্ব্বে যখন সুধারামের অবস্থা ভাল ছিল, তখন বিপ্রদাস অমলার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু যখন কোন আত্মীয়েরই সহিত মকদ্দমায় অমলার পিতার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইল, তখন হইতে এই সম্বন্ধের কথা আর তিনি মুখে আনিতেন না।

অমলার মাতা বাল্যকাল হইতে বিজয়কে বড় ভালবাসিতেন। বাল্যকালে বিজয় প্রায়ই সুধারামের বাড়ীতে থাকিতেন, এবং অমলার সহিত একত্রে খেলাও করিতেন। এই জন্যে শৈশবাবস্থা হইতে উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিত, একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিত না। এখনও দুইজনের গোপনে গোপনে সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কেহই সে সাক্ষাতে সুখী হইত না। কখন ক্রন্দনে কখন বা বিনা বাক্যব্যয়ে সে সাক্ষাৎ শেষ হইত। এই গোপনে সাক্ষাতের বিষয় কেবল অমলার মাতা জানিতেন, কিন্তু কন্যাকে তাহার জন্যে কোন শাসন করিতেন না। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল—যখন বিজয় অমলাকে এতদূর ভালবাসে, তখন তাহার পিতার মত অবশ্যই হইবে; অধিক টাকা খরচ করিতে না পারিলেও এই বিবাহে কোন রূপ গোলযোগ হইবে না।

অমলা এই বিজয়ের সহিত প্রণয়ের কথাই শান্তকে গোপনে বলিয়াছিল। এখন অমলার পরিচয় এক প্রকার দেওয়া হইল, তার পর তাহার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার পরিচয় পরে দিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণে প্রাণী মাত্রেই যেন মৃতপ্রায়। রাস্তায় মানুষের সমাগম বড় দেখা যায় না। বৃক্ষে পক্ষিগণের সে মধুর কণ্ঠরব এখন আর শুনিতে পাওয়া যায়

না। প্রকৃতি শান্তিপূর্ণ নীরব ও নিঃস্তব্ধ। সেই শান্তিপূর্ণ, নীরব ও নিঃস্তব্ধ প্রকৃতি কম্পিত করিয়া কাহার কণ্ঠস্বর শুনা গেল —"যে পিতা অর্থের অনুরোধে পুত্রের জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তিনি অর্থ লইয়াই সুখী হউন, পুত্রে তাঁহার প্রয়োজন নাই।" তার পর আবার প্রকৃতি শান্তিময়, নীরব ও নিঃস্তব্ধ হইল। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর আসিল কোথা হইতে? তখন কেবল রাস্তার পার্শ্বস্থিত উদ্যান মধ্যে একটী আম্র বৃক্ষের তলায় এক যুবক বসিয়াছিল। কোন গুরুতর ব্যথায় যুবকের হৃদয় ব্যথিত, তিনি কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। যুবক সেই চিন্তায় অস্থির; সুতরাং হৃদয়ের বেগ দমন করিতে না পারায়, হঠাৎ তাহারই মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইয়াছিল। যুবকের সে কথা শুনিতে তাহার নিকটে অন্য কেহ ছিল না। সেই নিদারুণ কথা বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কিছু দূরে গেল এবং এক বালিকা ব্যতীত জগতের আর কোন প্রাণী তাহা শুনিল না। বালিকার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়কে আঘাত করিয়া আবার সে স্বর বায়ুতেই মিশাইয়া গেল। যুবকের সেই নিদারুণ কথায় আপনার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে বালিকা ধীরে ধীরে যুবকের নিকট আসিল; যুবক সেই সময় স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বালিকা অমনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া যুবকের পদতলে পড়িয়া গেল। যুবক বালিকাকে ধরিল। অতি যত্নের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বালিকা প্রকৃতিস্থ হইলে, যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"অমল, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?"

অমলা উত্তর করিল—"আমি তোমাকে ছাদের উপর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। এখানে অনেকক্ষণ আসিয়াছি, ঐ গাছের আড়াল হইতে তোমায় দেখিতেছিলাম, তার পর—"

বালিকা আর বলিতে পারিল না। এই সময় দুই বিন্দু চক্ষের জল যুবকের অজ্ঞাতসারে ভূতলে পড়িল। বালিকা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। যুবক বলিল—"আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি। আমি সংসার চাই না, সমাজ চাই না। চল অমলা, এমন কোনস্থানে যাই, যেখানে এই সকল অত্যাচার নাই। তোমার মুখ দেখিয়া, সকলের স্নেহ, সকলের ভালবাসা ভুলিব। আজ এই জন্যে তোমার নিকট আসিয়াছি। যে পিতার পুত্রের জীবনের সুখের প্রতি দৃষ্টি নাই, সে পিতার পুত্রের প্রতি স্নেহও নাই; যে সমাজ ইহা অনুমোদন করে, সে সমাজ হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। সে সমাজে বিবাহ হয় না, কেবল ক্রয় বিক্রয় হয়। এখন বল দেখি অমলা, তুমি আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত কি না?"

অমলা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাইব?"

সে প্রশ্নের উত্তর হইল—"পিতার গৃহ ভিন্ন এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে কি আমাদের স্থান হইবে না?"

"স্থান হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পলায়ন শুভ হইবে না; এরূপ করিলে তোমার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার অপযশ কখনই সহ্য করিতে পারিব না।"

"আমি সে কলঙ্কে ভীত নই।"

"কিন্তু আমি তাহাতে ভয় পাই; আমি এখনও অবিবাহিতা। যত দিন না আমাদের বিবাহ হয়, আমায় সঙ্গে করিয়া

কোথাও লইয়া যাইবার তোমার কোন অধিকার নাই।”

সে কথায় যুবক কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—“আমরা মনুষ্যের চক্ষে বিবাহিত না হইলেও ঈশ্বরের চক্ষে বিবাহিত; সুতরাং মনুষ্যের চক্ষে এ কার্য্য দূষণীয় হইলেও, ঈশ্বরের চক্ষে এ কার্য্য দূষণীয় নহে।”

“বিজয় আমি বালিকা, এত কথা বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই; কিন্তু আমি বুঝি যে, আমরা পলায়ন করিলে আমাদের দুই পরিবারের কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। সমাজে আমাদের পিতা মাতার মস্তক হেঁট হইবে। আবার আমাদের হারাইলেও তাঁদের মনোকষ্টের আর সীমা থাকিবে না। বল দেখি, বিজয়, পিতামাতার মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত?”

“অমলা, কি উচিত আর কি অনুচিত তা আমিও বুঝি। তুমি যে সকল কথা বলিলে তাহা উত্তম। তোমার কথায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে সামান্য কারণে আমি এরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হই নাই। আমার এই প্রস্তাবের উপর আমাদের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। শোন অমলা, আজ পলায়ন না করলে কাল আমার বিবাহ হইবে। তুমি ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না জানিয়া, পিতা গোপনে গোপনে এই বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এইমাত্র সে সংবাদ পাইয়াছি। সুতরাং আজ এ কার্য্য না করিলে কাল আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার হৃদয়কে বলি দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত সুখও ফুরাইবে।”

এই সকল কথা শুনিয়া অমলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কে যেন তাহার হৃদয়ে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। সে আঘাতে যেন সে ক্ষুদ্র হৃদয় চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অমলা কোন কথা কহিল না, কথা কহিবার ক্ষমতাও তখন তাহার ছিল না। কিছুক্ষণ পরে অমলার চক্ষে জল দেখা গেল—অমলা কাঁদিল।

সে কান্না দেখিয়া বিজয়ও কাঁদিল। আপনার হৃদয়ের বেগ দমন করিতে পারিল না! তাহারও হৃদয় এক অনিবার্য্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিজয় আপনি শান্ত হইয়া অমলাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। অমলা শান্ত হইয়া বহুকষ্টে বলিল—“এখন উপায়?”

“পিতার গৃহ পরিত্যাগ ভিন্ন এখন আর আমার অন্য উপায় নাই। অদ্য আমায় এখান হইতে গোপনে পলায়ন করিতে হইবে। কিন্তু তোমায় এখানে রাখিয়া যে যাইতে হইবে—এ কথা আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই। এখন সে কথা মনে হওয়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তোমার বিরহ সহ্য করিয়া যে কত দিন জীবিত থাকিব, তাহা বলিতে পারি না। অমলা, আমার প্রাণের ভিতর এরূপ করে কেন? এই বুঝি আমাদের শেষ দেখা হয়।”

অমলা বালিকা—বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় কত সহ্য করিতে পারে? অমলা ধীরে ধীরে আবার বসিয়া পড়িল, তাহারও প্রাণের ভিতর কি জানি কেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্বালা করিতে লাগিল। এই সময় বিজয় তাহার পিতাকে সেই-দিকে আসিতে দেখিল। বিদায় লইবার আর অবসর হইল না, বিজয় পিতার

দিকে অমলাকে ইঙ্গিত করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার সেই অশ্রুপ্লাবিত মলিন মুখখানি দেখিয়া লইল। তার পর সে স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"যদি জীবিত থাকি, যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে আবার সাক্ষাৎ হইবে, নতুবা এই আমাদের শেষ বিদায়।"

অমলা অবাক্ হইয়া রহিল। সে কথায় কোন উত্তর করিতে পারিল না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিজয়কে দেখা গেল, সে স্থান হইতে নড়িল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ সন্তোষপুর গ্রামের স্ত্রীমহলে বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কি ভদ্র কি অভদ্র, সকল স্ত্রীলোকই আজ একটি গুরুতর বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। বিষয়টি আর কিছুই নয়, কেবল আজ এত দিন পরে শান্তমণির স্বামী ভূতনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। এখন এই ব্যক্তি যথার্থ শান্তমণির স্বামী ভূতনাথ গাঙ্গুলি কি না—এই বিষয় লইয়া আজ সন্তোষপুরের হাটে, ঘাটে, মাঠে ও বিশেষতঃ স্ত্রীমহলে ভয়ঙ্কর আন্দোলন চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস হইতেছে না যে শান্তর প্রকৃত স্বামী আসিয়াছে। অনেকেই আবার এইরূপ ঘটনার নানারূপ গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিতেছে। কাহার মামার বাড়ীর দেশে, কাহার মাসীর বাড়ীর দেশে—এই রূপ জাল স্বামী আসিয়া কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, আজ এতদিন পরে সে সকল কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; এবং সে সকল কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহারও অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দেওয়া হইতেছে। শ কাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সকলে আন্তরিক ইচ্ছা যেন আগত ব্যক্তি শা প্রকৃত স্বামী না হইয়া জাল-স্বামী হয়।

এখন শান্ত আজ কি করিতেছে, দে যাউক। শান্ত আজ হাসেও না, কাঁদে না, কিন্তু তাহার ব্যথিত হৃদয় নিরাশা ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে আবা আশাবিদ্যুৎও খেলিতেছিল। শান্ত মনে মধ্যে বলিতেছিল—"হৃদয় শান্ত হও, আ ভাল করিয়া তোমার নিজের জিনি চিনিয়া লও। আর যদি তিনি আমা যথার্থ স্বামী না হন'—এই কথা ভাবিতে শান্তর চক্ষে জল আসিল। শান্ত সে জল মুছিয়া করজোড়ে বলিল—"জগদীশ্বর তুমিই একমাত্র অবলার ভরসা; আমি যত কাল বাঁচিব, আমার সেই স্বামী প্রত্যাশায় থাকিব, সে বরং ভাল, ত যেন প্রতারিত হইয়া আজ আমার ধর্ম্ম ন না হয়।"

এমন সময় অমলা আসিয়া সংবাদ দিল—"দিদি, তুমি ভাব কেন? যিনি আসিয়াছেন, তিনিই আমাদের গাঙ্গুলি মহাশয়। কাকা তাঁহার সমস্ত পরিচয় লইয়া বলিয়াছেন—সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"

অমলার কথা শুনিয়া শান্তর হৃদয় স্থির হইল বটে, কিন্তু লজ্জায় কোন কথাই কহিতে পারিল না। তার পর অমলা কোথা হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল আনিয়া শান্তর চুল বাঁধিতে বসিল। শান্ত এতকাল চুল বাঁধিত না, ইচ্ছা না থাকিলেও আজ কিন্তু অমলার কাজে ব্যাঘাত দিল না। কি জানি কেন—তাহার হৃদয়ের

ভিতর এই সময় হইতে গুন্ গুন্ করিতে লাগিল।

একদিকে গ্রামের কুলবতী, রূপবতী, গুণবতী, অরূপবতী, যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা প্রভৃতি দলে দলে আসিয়া বাড়ী পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রথমে তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে, জাল-জামাই লইয়া কিছু রঙ্গ করিবে, এবং পরিশেষে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু সকলে যখন শুনিল যে, এ ব্যক্তি জাল নহে, যথার্থই ভূতনাথ গাঙ্গুলি, তখন অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইল। কিছুক্ষণ পরে আবার তাহারা এক নবোৎসাহে মাতিল। সকলেই তখন জামাতাকে লইয়া আমোদ করিবার জন্যে একবারে অধীর হইল। তাহাকে আনিতে ক্রমাগত বাহিরে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু কি জানি কেন, ভূতনাথ বাড়ীর ভিতর আসিলেন না। অনেকেই তাঁহাকে অরসিক প্রভৃতি গালি দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

ভূতনাথ বাড়ীর ভিতর যান না; তাহার কারণ এই যে, সে একজন প্রধান কুলীন; কুলীন জামাতার প্রাপ্য আদায় না করিয়া কিরূপে বাড়ীর ভিতরে যাইবে? ভূতনাথের শ্বশুরবাড়ী ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু এখানে সে পক্ষে ভূতনাথের কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছে, কারণ শ্বশুর বাড়ী আসিয়া কড়া-তামাক না পাওয়াতে নিজের দুইটি পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে ক্রয় করিয়া আনিতে হইয়াছে, সুতরাং ভূতনাথের সন্দেহ করিবার কারণও আছে। শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া নিজের পয়সায় নেশা কিনিয়া আনা ভূতনাথের এই প্রথম। দুই ঘণ্টার মধ্যে ভূতনাথ তাহা নিঃশেষ করিয়া এখন রাগে কাঁদিতেছিল; এমন সময় তাহার শ্বশুর গিয়া বলিলেন—"বাবাজী, বেলা অধিক হইয়াছে, এখন স্নান আহারাদি করিলে ভাল হয় না?"

ভূতনাথ রাগিয়া বলিল—"এখানে সে সকল কিছু হবে না, আমি এখনি এখান হতে চলে যাব।"

"সে কি? কেন—তোমার কি কোন অযত্ন হইয়াছে?"

"আমার যথেষ্ট অপমান ও অযত্ন হইয়াছে। কুলীনের ছেলের মান রক্ষা করা বড় সহজ নয়; আমি পেচ্ছাব করলে কত বেটা বামুন হয়ে যায়।—কুলীনের ছেলেকে মেয়ে বড় বিবেচনা করে দিতে হয়। সেই বিয়ের পর আজ ৮।১০ বৎসর পরে এখানে এসেছি, তাকি নিজের পয়সা খরচ করে নেশা করিতে হবে?"

"নেশা আবার কি বাপু?"

"এত বয়স হয়েছে, আর নেশা কাকে বলে জান না? এই গাঁজা, গুলি, চরস, আফিম—বুঝলে কি? কুলীন জামাই করলে বাবা, এই সকল হর্‌দম্ এনে যোগাতে হয়, তবে সে শালার শ্বশুর বাড়ী মন বসে।"

জামাতার এই কথা শুনিয়া শ্বশুরের আপাদমস্তক রাগে কাঁপিতে লাগিল—তিনি নীরবে ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে আপনার কন্যার বৈধব্য কামনা করিলেন এবং আর একজন কাহাকে গালি দিলেন। ব্রাহ্মণ পরে একজন আত্মীয় লোকের দ্বারা জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার মান রক্ষা করা হইবে, এবং এখানে থাকিলে যাহা যাহা আবশ্যক হইবে, তাহার কিছুরই অভাব হইবে না, কিন্তু এখন স্নানাহার করা হউক।

ভূতনাথ স্নান করিল না, কিন্তু সে ত্রুটি আহারে সে পূরণ করিয়া লইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ শান্তর বড় আহ্লাদের দিন। কিন্তু সেই আহ্লাদের সঙ্গে শান্তের ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছিল। শান্ত কখন স্বামী সম্ভাষণ করে নাই। কিরূপে সম্ভাষণ করিতে হয়, তাহা সে জানেও না। অদৃষ্ট-ক্রমে তাহার স্বামীর সহিত পরিচয়ও নাই। এই সকলের উপর আবার স্বামীর গুণের কথা প্রচার হওয়ায়, শান্তর ভয় আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই আনন্দ ও ভয় মিশ্রিত হৃদয় সকলকে বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু এই স্থলে আমাদের বলা আবশ্যক যে শান্ত তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাঁহার স্বামীর জন্যে যে ভাল-বাসা এতকাল পুষিয়া রাখিয়াছিল, অদ্যকার এই সকল ঘটনায় তাহার বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই।

শান্তর সুখ দুঃখের সহচরী অমলা তাহার নিকটেই ছিল। অমলার মনে সুখ ছিল না, কিন্তু আপনার মনের সে অসুখ মনেতেই চাপিয়া রাখিয়া তাহার শান্তদিদিকে সুখী করিতে আজ আসিয়াছিল। অমলার যতদূর সাধ্য সে শান্তর বেশভূষা করিয়া দিয়াছিল; এবং যথাসাধ্য সৎপরামর্শ দিতেও ত্রুটি করিল না।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তখন অমলা ঘরে গেল। কিন্তু নানা চিন্তার উপর আবার তাহার শান্ত দিদির ভাবনাও তাহাকে ভাবিতে হইল, সুতরাং সে রাত্রে কিছুতেই নিদ্রা হইল না। এদিকে শান্ত শয়নগৃহে গিয়া ভয় ও আহ্লাদমিশ্রিত হৃদয়ে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় স্বয়ং ভূতনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূতনাথ সে ঘরে আসিয়াই স্ত্রীকে হুকা তামাক প্রভৃতি আনিতে হুকুম করিলেন। কিন্তু স্বামীর জন্য বাহির হইয়া সে সকল অনুসন্ধান করিয়া আনিতে শান্তর বড় লজ্জাবোধ হইল, সুতরাং ভূতনাথের সে হুকুম পালন হইল না। তখন ভূতনাথ স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—"কি! আমার কথার অবাধ্য। আমি অমন স্ত্রীর মুখ দেখ্‌তে চাই না।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত স্বামীর সেই ক্রোধ-মূর্ত্তি দেখিল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! মনে মনে ভয় আরও বাড়িল—লজ্জা দূর হইল। শান্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া সমস্ত আনিয়া দিল।

ভূতনাথ প্রথমে তিনবার তামাক খাইল, তাহার পর একডিগ্রি উঠাইয়া দিল। চরস খাওয়া হইল, কিন্তু তাহাতেও স্ফূর্ত্তিবোধ না হওয়ায় পুনরায় আরো এক ডিগ্রি উঠিল। এক ঘণ্টার মধ্যে ২।৩ ছিলিম গঞ্জিকা ভস্ম হইল। এ সকল ঘট-নার পর স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল,—"দ্যাখ্, তোর বাপ আমার যথেষ্ট অপমান করেছে, আমার মান কিছুই রাখে নাই; শ্বশুর-বাড়ী এসেও ঘরের পয়সা খরচ করে নেশা করিতে হয়েছে। তোর বাপের সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই, সে বিবাহের পর থেকে আমায় আর এক পয়সাও দেয় নাই। তুই যদি আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাস্, তবে তোর কি টাকা কড়ি আছে, সব আমায় দে। টাকা না পেলে আমরা স্ত্রীর মুখ দেখি না।"

স্বামীর এই সকল কথা শুনিয়া শান্ত অবাক্ হইল। তাহার সকল আশা,

কল ভরসা শেষ হইবার উপক্রম হইল। স্ত কি করিবে—কি উত্তর দিবে—কিছুই র করিতে পারিল না। তাহার নিষ্ঠুর মী এবার গর্জ্জিয়া বলিল—"চুপ করে ইলি যে? যাহা হয় স্পষ্ট করে বল্। াকা আগামী না, পেলে আমি কোন শুর-বাড়ী যাই না।' আগামী পাওয়া রে থাক, শ্বশুর-বাড়ী এসে দশ ঘণ্টা পরেও াওয়া গেল না!"

তখন ধীরে ধীরে ক্ষীণ করুণস্বরে উত্তর ইল—"আমি টাকা কোথায় পাইব?" াস্তর স্বর করুণরসোদ্দীপক। সে স্বর ুনিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রব হয়, কিন্তু তাহাতে াহার নিষ্ঠুর স্বামীর হৃদয় কিছুই ব্যথিত ইল না।

ভূতনাথ পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিল—"তুই এতদিন বাপের বাড়ী আছিস্ তোর চরিত্র কখনই ভাল নয়, কিন্তু টাকা না পেলে আমি কি তা সহ্য কর্‌বো? তুই যে কিছুই টাকা রোজকার করিস্ নাই—তার প্রমাণ কি?"

শান্ত মনে মনে ভাবিল—"ভগবান, ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয় নাই কেন? আজ আমার স্বামীর মুখে আমায় এ কথা শুনিতে হইল!"

ঘৃণায়, ভয়ে, লজ্জায় শান্ত একবারে মৃতপ্রায় হইল। নিঃশব্দে বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

তাহার পর ভূতনাথ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমি চল্লুম, এরূপ স্ত্রীর কাছে যে আসে সে শালা।"

স্বামী প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া এইবার শান্তরও জ্ঞান হইল। দৌড়িয়া গিয়া স্বামীর চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন; আপনি আমার পক্ষে দেবতাস্বরূপ। আমি এজীবনে সে দেব সেবা করিতে পাই নাই। অনেক দিনের পর আমার সে সাধ পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমার সে সাধে বঞ্চিত করিবেন না। আপনি থাকুন, কাল যেখান হইতে পারি, আপনাকে টাকা দিব। আমার এই বয়সে আমি আপনার জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আর আমায় কষ্ট দিবেন না।"

লিখিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, তার পর পতিপ্রাণা স্বাধ্বী রমণীর পুরস্কার হইল—পদাঘাত!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় তিন মাস গত হইল, বিজয় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বিপ্রদাস অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই। তিনি যে বিজয়ের বিবাহের ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে কথা অতি গোপনীয় হইলেও এখন কাহার জানিতে বাকি ছিল না। তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা বিজয় অবাধ্য বলিয়া তাহারই নিন্দা আরম্ভ করিল। বিজয়ের মাতা প্রতিদিন পুত্রের জন্যে কাঁদিত, এবং বিপ্রদাসকে ভর্ৎসনা করিত।

বিজয় পলায়ন করিলে পর, অমলার বড় কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অমলা সে কষ্ট লজ্জাবশতঃ কাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিত না। অমলা এখন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে, আর মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জননী এই সকল বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিলেন। তার পর এক দিন স্বামীর সহিত

এই বিষয় লইয়া পরামর্শে এই স্থির হইল —যেরূপে হউক, এই মাসের মধ্যেই অমলার বিবাহ দিতে হইবে। সুধারাম অনেক কষ্টে পুত্রদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন, এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটী পাত্র স্থির করিলেন। পাত্র যদিও কোন অংশে অমলার উপযুক্ত নয়, কিন্তু ব্যয় অল্প হইবে বলিয়া সুধারাম অগত্যা সেই পাত্রই স্থির করিতে বাধ্য হইলেন।

অমলা তাহার বিবাহের কথা শুনিল। তাহার জ্বালার উপর আরো জ্বালা বাড়িল। দিন দিন বড় ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্রমে অমলার শরীর এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল —অমলা কোন কাজ করিতে পারে না, এখন উঠিতে বসিতে তাহার বড় কষ্ট বোধ হয়। বিবাহের যখন আর পাঁচ দিবস মাত্র অবশিষ্ট, তখন অমলা এক দিন তাহার জননীকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল —"মা, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না, আমার কোন উৎকট রোগ হইয়াছে, বাবাকে এখন বিবাহ বন্ধ রাখিতে বল।"

অমলার মাতা মনে করিয়াছিল, কন্যার শরীরে কোন রোগ নাই, যাহা কিছু রোগ তাহার মনে। সে রোগ বিবাহ দিলেই আরোগ্য হইবে। কিন্তু কন্যার কথা শুনিয়া এখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি অমলার গাত্র স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—তাহার বিলক্ষণ জ্বরভোগ হইতেছে। গৃহিণী দৌড়িয়া গিয়া কর্ত্তাকে এ সংবাদ দিল। কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া একজন চিকিৎসককে আনিলেন। চিকিৎসক অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"রোগ সাংঘাতিক—জীবন রক্ষা হওয়া সন্দেহ।" সুধারাম ও তাহার স্ত্রী এ কথা শুনিয়া একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। গৃহিণী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কর্ত্তা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। অমলার বিবাহ এখন আপাততঃ বন্ধ রহিল।

রীতিমত চিকিৎসা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে রোগের কোন প্রতিকার হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অমলার পীড়া হওয়া অবধি শান্তমণি সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকিয়া রোগীর সেবা করিত; শান্ত এই কয় দিবস এইরূপ অমলার সেবায় ব্যস্ত ছিল যে, আপনার নিদারুণ মনোকষ্টের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল সর্ব্বদাই অমলার জন্যে ভাবিত। একদিবস বৈকালে অমলা শান্তকে ডাকিয়া বলিল—"শান্তদিদি আমার ত দিন ফুরাইয়া আসিল, মরিবার পূর্ব্বে কি একবার দেখা হইবে না?"

শান্ত চক্ষের জল মুছিয়া বলিল— "বালাই, তুমি মরিবে কেন?"

"দিদি আজ ডাক্তার কি বলিল?"

"আজ কয় দিন অপেক্ষা ভাল বলিয়াছে।"

"কিন্তু দিদি, আজই আমি মরিব। আজ ঠিক ছয় মাস পূর্ণ হইল, বিজয় চলিয়া গিয়াছে। সে মুখ না দেখে ইহার অধিক দিন কি আর বাঁচিতে পারা যায় দিদি?"

"অমলা, তুমি যাহাকে বালবাস, তাহাকে ছয় মাস দেখ নাই বলিয়া মরিবে, আর আমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামীকে ছয় বৎসরেরও কত অধিক পরে একবার দেখিলাম, আর সেও কিরূপ দেখা তাহা ত তুমি জান।"

শান্তর কথা শুনিয়া অমলা ঈষৎ হাসিল। ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলিল। সে হাসি সাধারণ

সি নয়, শান্ত সে হাসির অর্থ বুঝিল। ই সময় একজন যুবা উন্মত্তের ন্যায় সে হে দৌড়িয়া আসিল। অমলা তাহাকে খিয়া বলিল—"দিদি, আমার চক্ষে জল ড়িতে দিও না, তুমি জল ভাল করিয়া ছাইয়া দাও, আমি একবার জন্মের সাধ গল করিয়া দেখিয়া লই।"

যে উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়াছিল, ন গৃহের মধ্যে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়া- ল এবং বিস্মিতলোচনে অমলাকে দেখিতে াগিল—মুখে একটীও কথা শুনা গেল া। এই সময় অমলা ক্লান্ত হইয়া আবার য়ন করিল, কিন্তু শয়ন করিতে করিতেই তাহার মুখ বড় বিবর্ণ হইল। চক্ষু কপালে উঠিতে লাগিল। শান্ত ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! তখন সকলে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল—অমলার অন্তিমকাল উপস্থিত! চারি দিকে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, আর দেখিতে দেখিতে অমলার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল! এ আবার কি! অমলার মৃতদেহের উপর আর একটি দেহ পতিত হইল যে! সে দেহ বিজয়ের। কি সর্ব্বনাশ! বিজয়ের দেহেতেও প্রাণ নাই যে! সব ফুরাইল। অবিবাহিতা বয়ঃস্থা কন্যা গৃহে রাখিবার বিষময় ফল সুধারামের অদৃষ্টে ঘটিল; আর পুত্রের বিবাহের অর্থলোভের বিষময় ফল বিপ্রদাসও হাড়ে হাড়ে বুঝিল।

সমাজ-চিত্র।

সতীর স্বর্গারোহণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"এরূপ গোপনে বিবাহ কেন?"

বামহস্তস্থিত নস্যাধার হইতে সজোরে একটিপ নস্য গ্রহণ করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—"এরূপ গোপনে বিবাহ কেন?"

প্রশ্নের উত্তরে রামগোপাল বিনীতভাবে কহিলেন—"আপনি যখন আমাদের কুল-পুরোহিত হয়েছেন, তখন আপনার কাছে আর কোন কথা গোপন রাখ্‌বো না। আপনার মাতুল আমাদের সাংসারিক সকল কথাই জান্‌তেন। দুর্গাবতী যে আমার কন্যা নয়—এ কথা কি আপ্‌নি জানেন?"

তর্কালঙ্কার মহাশয় সবিস্ময়ে কহিলেন—"তাত বাপু, জানি না। আমি তোমারই কন্যা বলে জানি।"

রাম। দুর্গাবতী আমার কনিষ্ঠ সহোদর নবীনগোপালের কন্যা। আপনি বোধ হয় জানেন—নবীনগোপাল একজন নামজাদা ব্রাহ্ম।

তর্ক। তোমার কনিষ্ঠ সহোদর যে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হ'য়ে সপরিবারে গৃহত্যাগ করে গিয়েছেন—একথা আমার স্বর্গীয় মাতুলের মুখে অনেকবার শুনেছি।

রাম। দুর্গাবতী জন্মিবার দেড়বৎসর পরেই নবীনগোপালের আর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, ছোট বউ-মা সেই পুত্রকে মানুষ করেন, আর আমারই বন্ধ্যা স্ত্রী সেই সময় থেকে দুর্গাবতীকে মানুষ করতে থাকে। নবীনগোপাল যখন পৈত্রিক সম্পত্তি আমায় সমস্ত বেচে-কিনে, বাড়ী থেকে সপরিবারে চলে যায়, তখন দুর্গাবতীর বয়স পাঁচ বৎসর হবে। সে আমার স্ত্রীকে ছেড়ে নিজের বাপ-মার সঙ্গে কোন মতেই যেতে স্বীকার হলো না। আর আমার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। সেই থেকে তার বাপ-মার সঙ্গ ছাড়াছাড়ি হ'য়েছে; সে আমাকেই তার বাপ আর আমার স্বর্গীয়া স্ত্রীকে তার গর্ভধারিণী বলেই জানে।

তর্ক। তা বেশ, কিন্তু সে কন্যার বিবাহ এরূপ গোপনে দিবেন কেন?

রাম। তার একটু কারণ আছে। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই নবীনগোপাল তার কন্যাকে দাওয়া করছে। আমার কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে—তার লোভে পড়েই এখনও সে এখানে তার কন্যাকে রেখেছে—কিন্তু হিন্দুমতে এরূপ অল্প বয়সে আমি তার কন্যার যে বিয়ে দিব—এই বিষয় তার কোনমতেই মত হয় না।

পাছে সে এসে কোন গোলযোগ করে, এই জন্যে বিবাহ খুব গোপনে আমায় দিতে হবে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তার পর দুই তিন বার নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"কন্যার এখন বয়ঃক্রম কত?"

রামগোপাল উত্তর করিলেন—"তা বারো বৎসর প্রায় উত্তীর্ণ হয়। ভায়া বলে, এরূপ অল্প বয়সে হিন্দুমতে তার কন্যার বিয়ে হলে, ব্রাহ্ম সমাজে তার মাথা হেঁট হবে।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি! কন্যাকাল ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবে আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, গোপনেই বিবাহ দাও। আচ্ছা, পাত্র কোথায় স্থির করেছ বাপু?"

রাম। পাত্র আমার ঘরেই আছে। পাত্রের পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, এক্ষণে তিনি গত হয়েছেন—পাত্রেরও আর কেউ নাই। এখন এই বিয়ের জন্যেই আমি তাকে ঘরে রেখেছি।

তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন—"তবে তুমি ত বাপু, সমস্ত যোগাযোগ ঠিক করেই রেখেছ। পাত্রটি সুপাত্র ত?"

রামগোপাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, পাত্রটী সর্ব্বাংশেই ভাল। আর আমাদের স্বঘর। আমি এখনই তাকে ডাক্‌ছি। কারণ, তার সঙ্গেও আমার বিশেষ কথা আছে। সে সকল কথা আপনার সম্মুখে হলেই ভাল হয়।"

এই কথা বলিয়া তিনি ডাকিলেন—"খগেন্দ্র!" তৎক্ষণাৎ একটি অষ্টাদশ বৎসরের যুবা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রামগোপাল খগেন্দ্রকে কহিলেন—"পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম কর।"

খগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিল। রামগোপাল তাহাকে বসিতে অনুমতি করিলেন। খগেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট হইলে তিনি কহিলেন—"খগেন্দ্র, আমি তোমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি, সেই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমি দুর্গাবতীর বিয়ে দিচ্ছি। আর দুর্গাবতীও তোমার যে মনোমত হয়েছে, আর প্রমাণও আমি অনেক পেয়েছি। কিন্তু তোমায় একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

খগেন্দ্রনাথ বিনীত ভাবে উত্তর করিল—"কি প্রতিজ্ঞা আজ্ঞা করুন।"

রামগোপাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত এ বিবাহ তোমায় গোপন রাখ্‌তে হবে। এমন কি বিবাহের পর, আমি যতদিন জীবিত থাক্‌বো, তুমি আমার বাড়ীতে পর্য্যন্ত আস্‌বে না। আমার মৃত্যুর পর, তুমি এই বিয়ের কথা প্রকাশ কর্‌বে এবং আমি যা কিছু রেখে যাবো, এ সব তোমরা দুজনেই ভোগ কর্‌বে। বিয়ের পর, তুমি আমার এক আত্মীয়ের নিকট এলাহাবাদে থাক্‌বে, সেখানকার কলেজেই পড়া-শুনা কর্‌বে, আমি তোমার সমস্ত খরচপত্র যোগাবো। কেমন, তুমি এ বিষয়ে সম্মত আছত?"

খগেন্দ্রনাথ পুনরায় বিনীতভাবে উত্তর করিল—"আপনি যা অনুমতি কর্‌বেন, আমি তাই কর্‌বো।"

রামগোপাল তখন কহিলেন—"আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।"

খগেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে পর, তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন—"তবে কন্যা

বিবাহের ভাল দিন আছে, লগ্নটাও দুই প্রহরের পর, আপনি সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখুন।"

রায়। আর এক কথা—বিবাহ আমার বাড়ীতে হবে না; উদ্যোগ আপনি সমস্ত করে রাখবেন, ব্যয় যা হয় আপনাকে দিচ্ছি। আপনাদের বাড়ীতে সম্প্রদান কার্য্য শেষ করবো। এ বিয়ে যতদূর গোপন রাখ্‌তে পারি—এই আমার ইচ্ছা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কি ভাবিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"তা বেশ বাপু বেশ। সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি সমস্ত উদ্যোগ করে রাখ্‌বো।"

পরদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় শ্যামপুর গ্রামে রেবতী নদীতীরস্থ কালীবাড়ীতে অতি গোপনে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। পাত্র খগেন্দ্রনাথ তাঁহার মনোমত পাত্রীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল, সুতরাং তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না; পাত্রী দুর্গাবতীরও সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আজ আর আনন্দ ধরে না; কারণ, পাত্র তাহার বিশেষ পরিচিত বাল্য-সখা। উভয়ের মধ্যে সেরূপ গাঢ় প্রণয় ছিল কি না, এ হিন্দু বিবাহে সে অনুসন্ধান রাখিবার আমাদের আবশ্যক করে না। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই উভয়ের মধ্যে যে এক প্রকার ভালবাসা ছিল,—এ কথা আমরা গোপন করিব না। কন্যা-কর্ত্তা রামগোপালও আনন্দে অধীর। তাঁহার অনেক দিনের মনোবাঞ্ছা আজ পূর্ণ হইয়াছে। পুরোহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও আজ আনন্দে উল্লসিত, কারণ, তিনি এই বিবাহ উপলক্ষে আশাতীত অর্থ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের আনন্দ আমরা কিরূপে বর্দ্ধন করিব, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে বিবাহে 'ছাঁদনাতলা' 'বাসর ঘর' প্রভৃতি নাই, সে বিবাহত পাঠিকাগণের মনোমত হইবেই না—ইহা স্থির নিশ্চয়। আর 'বাজ্‌না বাদ্যের' কথা দূরে থাকুক—আনন্দসূচক একটা শঙ্খ বা উলুধ্বনি পর্য্যন্ত যখন এ বিবাহে হয় নাই, তখন পাঠিকাগণ সমীপে এরূপ বিবাহ কখনই বিবাহমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আমাদের পাঠকগণের মুখ চাহিয়াও আমরা দুই এক কথা বলিব। যাহারা 'মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ' পক্ষ, তাঁহারা ত নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন; তাহা ব্যতীত যে বিবাহে বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীর সম্মিলন হইল না—সে বিবাহকে যে অনেকেই অভিসম্পাত করিবেন—ইহাও আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। এরূপ বিবাহের বিশেষ কোন বর্ণনা আর কি করিব? শুভক্ষণেই হউক, আর অশুভক্ষণেই হউক, পরদিন গভীর রাত্রে করালমূর্ত্তি কালিকাদেবীর সম্মুখে এই পরিণয় অতি গোপনে সম্পন্ন হইয়া গেল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার দুই বৎসর পরে, হঠাৎ বিসূচিকা রোগে রামগোপালের মৃত্যু হইল। দুর্গাবতী অকূলপাথারে পড়িল। কলিকাতায় নবীনগোপালের নিকট সে সংবাদ পাঠান হইল, কিন্তু এলাহাবাদে খগেন্দ্রনাথের নিকট কেহ সে সংবাদটা আর পাঠাইল না। যাহার উপর সে সংবাদ পাঠাইবার ভার ছিল, সেই তর্কালঙ্কার মহাশয় সে সময় গ্রামে উপস্থিত ছিলেন না। সেই গুপ্ত বিবাহের সংবাদ আর

কেহই জানিত না, সুতরাং কে আর খগেন্দ্রকে সংবাদ দিবে? নবীনগোপাল সংবাদ পাইবা মাত্র স্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ভ্রাতার ত্যাজ্য সম্পত্তির সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রামগোপালের একখানি উইল পাওয়া গেল। সেই উইলে তিনি তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দুর্গাবতীকে দান করিয়া গিয়াছেন—নবীনগোপালের অন্য পুত্র কন্যার তাহাতে কোন স্বত্ব নাই, দুর্গাবতী যতদিন না বালিকা থাকিবে, ততদিন সমস্ত বিষয় দুর্গাবতীর স্বামীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে—এই কথা লেখা ছিল। কিন্তু সে উইলে স্বামীর কোন নাম উল্লেখ ছিল না। রামগোপাল সর্ব্ব রকমে লক্ষ-টাকারও অধিক রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং নবীনগোপালের ভ্রাতৃবিয়োগে আনন্দ কি দুঃখের পরিমাণ অধিক হইল—তাহা আমরা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে সে উইলে তাঁহার কোন নাম উল্লেখ ছিল না—সে জন্যে যে নবীনগোপাল বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে সংবাদ আমরা জানি।

নবীনগোপাল একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন, সুতরাং তিনি মৃত ভ্রাতার কোন শ্রাদ্ধাদির বন্দোবস্ত না করিয়াই সমস্ত নগদ টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তির সহিত কন্যা দুর্গাবতীকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। দুর্গাবতীর প্রকৃতি বড়ই কোমল—সে বড়ই লজ্জাশীলা, এমন কি পিতার সম্মুখেও সে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। ব্রাহ্মপিতার সহিত কলিকাতায় আসিতে তাহার একান্ত মত ছিল না, কিন্তু সে কথা সে কি তখন মুখে বলিতে পারে? আর যাহার জন্যে সর্ব্বদাই তাহার প্রাণ কাঁদিতেছে,—এ দুঃখের সময় তিনি কোথায়? বুক ফাটিয়া গেলেও সে কথাও তাহার মুখে ফুটিবে না। দুর্গাবতী জানিত যে, তাহার জ্যেঠতাতের মৃত্যু সংবাদ পাইলেই খগেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন। এলাহাবাদে কত দিনে সংবাদ যায়, দুর্গাবতী দিবারাত্র কেবল তাহাই ভাবিত। সেখানে যে এ সংবাদ পাঠান হয় নাই—এ কথা দুর্গাবতীর মনে কখনও উদয় হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় যে গ্রামে নাই, এ সংবাদ দুর্গাবতী জানিত না। তাহার যেরূপ প্রকৃতি কোন কথা না বলিয়া নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। যাত্রাকালে গ্রামের অনেক সমবয়স্কা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের নিকটও দুর্গাবতী অনেক কাঁদিল। কান্নার কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথমতঃ পিতৃসম জ্যেঠতাতের মৃত্যু। তার পর আজীবন যে গৃহে প্রতিপালিতা হইয়া আসিতেছে, অতি শৈশব অবস্থা হইতে যাহারা তাহার সঙ্গিনী; যে সকল দাস-দাসীকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে, দুর্গাবতী থাকিতে পারিত না—এই সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইতেছে। সকলেই দুর্গাবতীর তাৎকালিক ক্রন্দনের এই সকল কারণ অনুমান করিয়া তাহার দুঃখে অশ্রুমোচন করিল। সে সময় কেহই তাহার এরূপ ক্রন্দনের প্রধান কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিল না।

দুর্গাবতী কলিকাতায় আসিল। এক-দিকে দেখিতে গেলে, কন্যা এত কালের পর তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া পিতামাতা ও ভাইভগিনী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইল। অন্যদিকে আবার আজন্ম হিন্দুগৃহে পালিতা, হিন্দুবালিকা সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্রাহ্ম পরিবারের অপরিচিত লোকের সহিত

আসিয়া মিলিত হইল। দুর্গাবতীর এ অবস্থার পরিবর্ত্তনে—সুখের কি দুঃখের বৃদ্ধি হইল? আমরা এখন দুর্গাবতীকে সুখী বলিব না দুঃখী বলিব—তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহার ব্রাহ্ম পিতামাতা, ও ভাইভগিনীর প্রতি দুর্গাবতীর কোনরূপ ভক্তি বা ভালবাসা ছিল না। যাহাদের সহিত এতকাল দেখা সাক্ষাৎ নাই, তাহাদের প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা কিরূপে জন্মাইবে? এখানে আসিয়া দুর্গাবতী আর এক বিভ্রাটে পড়িল। নবীনগোপালের স্ত্রী হৈমবতী তাহার যথার্থ গর্ভধারিণী জননী হইলেও তাহাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে দুর্গাবতীর কেমন ঘৃণাবোধ হইত। পল্লীগ্রামের হিন্দুগৃহে পালিতা দুর্গাবতী কেমন করিয়া সেই বিচিত্র বেশভূষাযুক্তা বুটধারিণী লজ্জাহীনাকে আপনার গর্ভধারিণী বলিয়া স্বীকার করিবে? জননীর কথা মনে হইলেই, রামগোপালের মৃতা স্ত্রী হরসুন্দরীর কথাই দুর্গাবতীর মনে উদয় হইত। তখন দুর্গাবতী আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না; ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত।

দুর্গাবতীকে পাইয়া তাহার জননী হৈমবতী বিশেষ আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু সে বিজাতীয় আদর ও অভ্যর্থনা দুর্গাবতীর কেমন ভাল লাগিল না। দুর্গাবতী প্রথম সাক্ষাতে জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে গেল, কিন্তু হৈমবতী তাহাকে সেরূপ ভাবে প্রণাম করিতে নিষেধ করিয়া, কেবল মাত্র তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। তার পর আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে হৈমবতী দুর্গাবতীকে যেরূপ যত্ন ও আদর আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দুর্গাবতীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল। প্রাতে সাতটার সময় দুর্গাবতীকে সকলের সঙ্গে চা' খাইবার পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইত; ঠিক দশটার সময় আহার, আবার দুইটার সময় জলযোগ, সন্ধ্যার পর পুনরায় চা' রাত্রি দশটার সময় পুনরায় আহার। সে আহার আবার স্ত্রীপুরুষ সকলের একত্রে। সুতরাং সকলের সম্মুখে লজ্জায় দুর্গাবতীর আর আহার হইত না। সে আহারের জন্যে আদর, যত্ন ও আয়োজন তাহার যেন বিষতুল্য মনে হইত। পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও দুর্গাবতীর প্রতি স্নেহময়ী জননীর বিশেষ অত্যাচার বা যত্ন আরম্ভ হইল। বুট, ষ্টকিং, সেমিজ, বডী, ও নূতন ধরণের সাড়ি প্রভৃতি তাহাকে প্রদত্ত হইল। হৈমবতী অতি যত্নের সহিত সে সকল পরিধান করিবার পদ্ধতিও কন্যাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু জননীর সে স্নেহের মূল্য বুঝিতে না পারিয়া, বরং তাহার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে—দুর্গাবতী এইরূপ মনে করিতে লাগিল।

এদিকে নবীনগোপালের কন্যা দুর্গাবতী এরূপ মূল্যবান সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছে, এ সংবাদ যখন ব্রাহ্মমহলে প্রচার হইল, তখন অবিবাহিত ব্রাহ্ম [illegible]ক-দলের মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল প[illegible] গেল। তখন দলে দলে বিবাহপ্রার্থী যুবকগণ আসিয়া নবীনগোপালের গৃহ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। গৃহিণী হৈমবতীর আর আনন্দের সীমা নাই; সে আনন্দে তিনি দৈনিক উপাসনা পর্য্যন্ত করিতেও ভুলিয়া যাইতেন! যে ব্যক্তি প্রথম আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জ্যোতিঃপ্রকাশ। জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত হৈমবতীর কিরূপ আলাপ হইল—আমরা নিম্নে তাহার পরিচয় দিতেছি। জ্যোতিঃপ্রকাশ আসিবা মাত্র হৈমবতী তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া

তাহাকে একখানি চেয়ারে উপবেশন করান হইল। জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রথমেই আরম্ভ করিলেন—"আপনার কন্যার আগমন সংবাদ শুনে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্ত আমি দৌড়ে আস্‌ছি।"

সে সময় দুর্গাবতীও সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। দুর্গাবতীর প্রতি ঈষৎ বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ইনিই বুঝি আপনার কন্যা? আপনি আমার সঙ্গে পরিচিত করে দিন্।"

হৈমবতী তৎক্ষণাৎ কন্যার হাত ধরিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের সম্মুখে আনিবার জন্যে তাহাকে টানাটানি করিতে লাগিল। সম্মুখে আসিতে দুর্গাবতীর আন্তরিক অনিচ্ছা দেখিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনার কন্যা এরূপ লজ্জাশীলা কেন?"

হৈমবতী মনে মনে কন্যার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমার কন্যা হলে কি হবে? পল্লীগ্রামের হিন্দুগৃহে যে পালিতা।"

জ্যোতিঃ। আপনার কন্যার নাম?

হৈম। নামটা বড় কুরুচিপূর্ণ, সেই কারণ আপনার কাছে বল্‌তে আমার বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে।

জ্যোতিঃ। কুরুচিপূর্ণ হলেও, আপনি যখন সে নামকরণ করেন নাই, তখন আপনার আর সে বিষয়ে লজ্জা কি?

হৈমবতী কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"তারা আমার কন্যার নাম রেখেছে—দুর্গাবতী।"

এই নাম শুনিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ একবারে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ যে শুধু কুরুচিপূর্ণ নয়, এ যে ঘোরতর পৌত্তলিকতাপূর্ণ। আপনি শীঘ্র এ নাম পরিবর্জন করুন। ও নাম মুখে আনতে আমার দেহ ঘৃণা বোধ হচ্ছে।"

হৈম। তবে আপনি আমার কন্যার একটি নাম পছন্দ করুন।

জ্যোতিঃ। আমি সে বিষয়ে বড় পটু নই, আপনি নাম স্থির করুন, সে নাম পছন্দ-সই কিনা, তা বরং বল্‌তে পারি। আর আপনার এরূপ সুন্দরী কন্যার নাম হঠাৎ স্থির করে আমি বল্‌তেও পার্‌বো না। এ সম্বন্ধে আপনি অবশ্য একটা নাম মনে মনে স্থির করে রেখেছেন।

হৈমবতী কন্যার রূপের সুখ্যাতিতে আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—"আচ্ছা, বিনোদিনী নাম হলে কিরূপ হয় বলুন দেখি?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"কেন—বিনোদিনী নামত বেশ নাম, আপনার কন্যা যথার্থই বিনোদিনী।"

তাহারই সম্মুখে তাহারই সম্বন্ধে জননীর সহিত একজন অপরিচিত যুবকের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া দুর্গাবতী লজ্জায় যেন মৃতপ্রায় হইয়া গেল, এবং অবনতমস্তকে অনেক দেবদেবীর নিকট কেবল আপনার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। তাহার মতে ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত ও লজ্জাকর বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু এদিকে হৈমবতী এরূপ সুশিক্ষিত যুবকের নিকটে তাঁহার কন্যার রূপের সুখ্যাতি শুনিতে পাইলে, স্বর্গসুখও অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে পারেন!

জ্যোতিঃপ্রকাশ এইবার কহিল—"আচ্ছা, আপনার কন্যার শিক্ষা কতদুর পর্য্যন্ত হয়েছে?"

হৈমবতী এইবার গোলে পড়িল। কারণ, দুর্গাবতীর যে বর্ণজ্ঞানও ছিল না, সে কথা হৈমবতী জানিত। কিন্তু সে কথা

গোপন করিয়া বলিল—"আমি এখনও সে বিষয় সবিশেষ জানি না।"

জ্যোতিঃ। ইউনিভারসিটির কোন পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল কি?

এবার হৈমবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"না।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ঈশ্বর কাকেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করেন না। আপনার এরূপ সুন্দরী কন্যা সুশিক্ষিতা হলে, নিশ্চয়ই একটি রমণীরত্ন হতেন। তা এখনও যথেষ্ট সময় আছে, আপনি ভালরূপ শিক্ষা দিন, তা হলেই কুসংস্কার, লজ্জা আর এইরূপ অসামাজিক ভাব সব দূর হয়ে যাবে।"

হৈমবতী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"সে শিক্ষার ভার ওর ভাবি-স্বামীর উপর দেওয়া যাবে। আমি উপযুক্ত পাত্র পেলেই কন্যার বিবাহ দেবো।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"সে যুক্তি ভালই করেছেন; আপনার কন্যার পাত্রের অভাব হবে না। শত শত অবিবাহিত সুশিক্ষিত যুবা আপনার কন্যার জন্য লালায়িত হয়ে আছে। যে আপনার কন্যাকে লাভ করবে, তার মতন সৌভাগ্যবান বোধ হয়, এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই।"

এই কথায় হৈমবতীর আহ্লাদের আর সীমা নাই। অকস্মাৎ অহঙ্কারে হৈমবতীর হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। কারণ কি রূপে, কি ধনে, কি বিদ্যায় সকল বিষয়েই জ্যোতিঃপ্রকাশই তাঁহার কন্যার উপযুক্ত পাত্র; সুতরাং তাহারই মুখে কন্যা সম্বন্ধে এরূপ কথা শুনিলে, জননীর আহ্লাদ ও অহঙ্কার হইতেই পারে। হৈমবতী আহ্লাদে বলিয়া ফেলিল—"যাহাতে আপনি আমার কন্যার মনোমত হন, আমি সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করবো।"

সে কথা শুনিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশও আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন—"আমি কিরূপে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দেবো—তা আমি জানি না।"

এদিকে দুর্গাবতীর প্রাণের ভিতর যাহা হইতেছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম। দুর্গাবতী এক একবার মনে মনে ভাবিতেছিল, ইহা কি স্বপ্ন না সত্য? এইরূপ কথোপকথনের পর জ্যোতিঃপ্রকাশ বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং কল্য কোন্ সময় আসিলে, অভ্যর্থনা পাইবেন, সে কথাও জানিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ প্রত্যহ দলে দলে বিবাহপ্রার্থী যুবকগণ আসিতে লাগিল, কিন্তু সেইদিন হইতে দুর্গাবতী প্রাণান্তেও তাহাদের সম্মুখে আর বাহির হইত না। সুতরাং তাহারা যেরূপ আনন্দে ও উৎফুল্লমনে সে বাড়ী প্রবেশ করিত, ততোধিক নিরাশ ও বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া যাইত। দুর্গাবতী শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া কেবল শয্যায় পড়িয়া কাঁদিত, আর প্রতি মুহূর্ত্ত একজনের আশাপথ চাহিয়া থাকিত। দুর্গাবতী মনে মনে বলিত—"কোথায় তুমি জীবনসর্ব্বস্ব, একবার এসো—একবার এসো। তুমি ভিন্ন আর কে আমায় এ নরক হতে উদ্ধার করবে? আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, কেবল তোমার আশায় এ জীবন এখনও রেখেছি।"

দুর্গাবতীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না—দুর্গাবতী ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিত না। কখন অল্প তন্দ্রা আসিলে, সে তৎক্ষণাৎ

খগেন্দ্রনাথকে স্বপ্নে দেখিত, তখন তৎক্ষণাৎ তাহার সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত। দুর্গাবতীর আহারে রুচি ছিল না, শরীর অসুস্থ ভাবে আহার সম্বন্ধে তাহার স্নেহময়ী জননীর হস্ত হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইত। প্রথমে কন্যার এই অসুস্থতার জন্য জনকজননী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। শেষে উভয়ের পরামর্শে এই স্থির হইল—কন্যার বিবাহ দিলে আর এ অসুস্থতা থাকিবে না। কন্যার মনোমত পাত্র স্থির করিতেও জনকজননীর কোন কষ্ট হইল না। জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে দুর্গাবতী যখন আর কোন যুবকের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিল না, তখন এই জ্যোতিঃপ্রকাশ ভিন্ন কন্যার মনোমত পাত্র আর কে হইতে পারে? সুতরাং নবীনগোপাল ও হৈমবতী অনেক তর্কের পর, জ্যোতিঃপ্রকাশকেই তাহাদের কন্যার মনোমত পাত্র বলিয়া স্থির করিলেন। তখন অন্যান্য বিবাহপ্রার্থীর আগমন বন্ধ হইয়া গেল, কেবল জ্যোতিঃপ্রকাশের অবারিত দ্বার। সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি, বৈকাল—যখন ইচ্ছা তখনই তিনি সে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে অনাহারে, অনিদ্রায়, ভয়ে, বিস্ময়ে ও চিন্তায় দুর্গাবতীর মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইতে লাগিল। এ কার্য্য এরূপ অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে সঙ্ঘটিত হইতেছিল যে, কাহার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। একদিন জ্যোতিঃপ্রকাশ দুর্গাবতীকে দেখিতে আসিলে, সে হাসিতে হাসিতে সেই গৃহ হইতে চলিয়া গেল। সে হাসি স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক—সেদিকে কাহারই লক্ষ্য ছিল না। সে হাসি দেখিয়া হৈমবতীর কিন্তু বিশেষ আনন্দ হইল। কারণ, এ হাসি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মনোমত অর্থ করিয়া লইয়াছিলেন। এই হাসিই দুর্গাবতীর সর্ব্বনাশের মূল হইল। পর দিবস জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত দুর্গাবতীর বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল!

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে নবীনগোপালের গৃহ আনন্দ ও উৎসবে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যুবক যুবতীগণ আজ মহা-আনন্দে দলে দলে আসিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের নানা জাতীয়, নানা বর্ণের, নানা ফ্যাসনের, নানা ভাবের পরিচ্ছদ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শঙ্খ ও উলু ধ্বনির পরিবর্ত্তে উচ্চ ও মধুর হাস্য ধ্বনিতে আজ নবীনগোপালের গৃহ প্রতিধ্বনিত। দুর্গাবতী যে গৃহ মধ্যে বসিয়াছিল, এখন সে গৃহে যেন সুন্দরীর মেলা বসিয়াছে। সকলেই সুন্দর সুন্দর বেশ ভুষায় ভূষিতা, কিন্তু দুর্গাবতীর এখনও সময়োচিত কোনরূপ বেশভূষা নাই। সেই কারণ, কোন সুন্দরী বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছিল—কেহ বা তাহার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। এমন সময় হেমবতী তাড়াতাড়ি দুর্গাবতীর নূতন পরিচ্ছদাদি আনিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে সেই পরিচ্ছদ পরাইবার বন্দোবস্তও করিয়া দিলেন। দুর্গাবতীর এখন কোনরূপ ভয়, লজ্জা, চিন্তা বা বিস্ময় কিছুই ছিল না। হিন্দুগৃহে হইলে, তাহার এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, কিন্তু এ ব্রাহ্মগৃহে সে বিষয়ে কেহই কোন লক্ষ্য করেন নাই! আজ তাহার সেই অ বিকৃত মস্তিষ্কের ভিতর বহুদিনের অভিলষিত প্রিয়-সম্মিলনের আশা কোথা হইতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সময় সেই লজ্জাভয়বিস্ময়হীনা দুর্গাবতী হাসিতে

বলিতে জননীকে বলিল—"আমার বর কখন আসবে মা ?"

অমনি সুন্দরীমহলে একটা বীণা-নিন্দিত মধুর হাসির ধ্বনি পড়িয়া গেল। অস্পষ্ট ভাষায় ও ইঙ্গিতে অনেক বিদ্রূপ এবং ঠাট্টাও চলিতে লাগিল। কন্যার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া হৈমবতীর আনন্দের সীমা ছিল না। তাহারই সংসর্গে এত অল্প দিনের মধ্যে কন্যার এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া হৈমবতী আপনাকেই মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল এবং কন্যার মুখচুম্বন করিয়া কহিল—"এখনই আস্‌বে। বিনোদ, তুমি কি বরের জন্যে এত অধীর হয়েছ মা ?"

দুর্গাবতীর পৌত্তলিক নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখন এই নূতন বিনোদিনী নাম রাখা হইয়াছিল। আমরা এখন হইতে দুর্গাবতী নাম পরিত্যাগ করিয়া এই বিনোদিনী নামেরই উল্লেখ করিব। বিনোদিনীর এখন আর সে হাসি নাই, বিনোদিনী এই বার কাতরকণ্ঠে বলিল—"আমি কত কাল তাঁকে দেখিনে যে মা।"

বলিতে বলিতে বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল! ভাবী স্বামী প্রতি কন্যার এইরূপ গাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছে ভাবিয়া, হৈমবতীর আর আনন্দ ধরে না। এই সময় এক সুন্দরী অন্য আর এক সুন্দরীর গা ঠেলিয়া বৈদ্যুতিক ইঙ্গিতের হাসির সহিত কহিল—"ওলো বিদ্যুল্লতা, তুই যে বড় প্রণয় প্রণয় করিস্—প্রণয় কাকে বলে স্বচক্ষে দ্যাখ্! এরই মধ্যে কত কাল হয়ে গেল—বুঝেছিস্।"

বিনোদিনী চক্ষের জল মুছিয়া কেমন একরূপ উদাসভাবে এইবার সেই সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া রহিল! বিদ্যুল্লতা নাম্নী সুন্দরী প্রথমোক্ত সুন্দরীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"দেখ ভাই হেমপ্রভা, কনে কেমন তোর দিকে চেয়ে আছে দেখ।"

হেমপ্রভা তখন বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন—"এই কি ভাই নব প্রণয়িনীর চাওনি ?"

এই সময় বিনোদিনী চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমার শীগ্‌গীর পোষাক পরিয়ে দে মা, বর বুঝি ফিরে গেল।"

বিনোদিনীর চীৎকারে অনেক সুন্দরী তাহাকে "অসভ্যা—অসভ্যা" বলিতে বলিতে নাসিকা আকুঞ্চিত করিয়া সে গৃহ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে "বর এসেছে" শব্দের সহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিনোদিনী প্রথমে আগ্রহের সহিত তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিল। সেই যে মস্তক অবনত করিল, সে মস্তক আর উন্নত হইল না। লজ্জাই ইহার কারণ অনুমানে উপস্থিত রমণীগণ তখন নানারূপ পরিহাস আরম্ভ করিল। কিন্তু বিনোদিনীর মুখে আর কথা নাই, সে মুখ সেই যে বন্ধ হইল, আর কেহ সে মুখে একটী কথাও শুনিতে পাইল না।

এদিকে বিবাহের উদ্যোগ প্রস্তুত। নিমন্ত্রিত সমস্ত ভদ্র নরনারী মন্দিরে বর-কন্যার অপেক্ষায় আছেন—এই সংবাদ যখন সেই বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন মহানন্দে সকলে বরকন্যা সঙ্গে লইয়া মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ স্বয়ং আচার্য্য বরকন্যাকে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রথমেই প্রার্থনা হইল। প্রার্থনার পর সঙ্গীত, সঙ্গীতের পর আচার্য্যের বক্তৃতা। সে বক্তৃতা প্রথমে বর কন্যাকে অনেক উপদেশ দেওয়া হইল, শেষে

আচার্য্যের আশীর্ব্বাদের সহিত সে বক্তৃতা শেষ হইল। অবশেষে বরকন্যা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে পর, উভয়ের মালা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এইরূপে মন্দিরে সেদিনকার বিবাহ কার্য্য শেষ হইল।

বিনোদিনীকে কলের পুত্তলিকার ন্যায় এই সকল কার্য্য কোন প্রকারে শেষ করিতে হইল। কি যে হইতেছে—তাহা বুঝিতে পারিল না; সেই নূতন দৃশ্য যেন তাহার স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। আবার কোন সময়ে তাহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত ছিল না। হঠাৎ বিনোদিনী কেমন জড়-ভরতের মতন হইয়া গেল। বিনোদিনী একবারে নীরব—নির্ব্বাক্ ও নিঃস্পন্দ!

যখন বিনোদিনীর অল্প জ্ঞান হইল, তখন সম্মুখস্থ ঘটনার কারণ বুঝিবার চেষ্টাও করিল, কিন্তু তাহার সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কলিকাতায় আসা পর্য্যন্ত, সে যে সকল বিস্ময়-জনক ঘটনা চক্ষে দেখিয়াছে, ইহাও তাহারই কোন আনুষঙ্গিক ঘটনা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সে যে পুনরায় ব্রাহ্মমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেছে, এ কথা তাহার মনে একবারও উদয় হয় নাই; সেই কারণ সে তাহার পূর্ব্ব পরিণয় সম্বন্ধে কোন কথা তখনও কিছুই বলিতে পারিল না। অর্দ্ধ জ্ঞানে ও অর্দ্ধ অজ্ঞানে এইরূপ বিকৃত-মস্তিষ্ক অবস্থায় তাহাকে সেই পরিণয় সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বা বলিতে বলা হইল, কোন যাদু-করের মোহিনীমন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সে সেই সমস্ত করিল বা বলিল।

এদিকে পরিণয় কার্য্য শেষ হইলে পর, বর মহোল্লাসে কন্যাকে লইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। সে গৃহও তখন আনন্দে ও উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত পরিণয়ের তিন দিবস পরে জ্যোতিঃপ্রকাশ বিষণ্ণ মনে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একাকী বসিয়া আছেন। জ্যোতিঃপ্রকাশের এখন হৃদয়ে বিষাদ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে সে হৃদয়ে কোন আনন্দ ও উল্লাসের চিহ্ন মাত্র নাই। এই পরিণয় সম্বন্ধে মনে মনে কত আশা, কত ভরসা ছিল, সে সকল আশাভরসাও এখন নির্ম্মূল হইয়াছে। আহ্লাদ ও উল্লাসের পরিবর্ত্তে জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রাণের মধ্যে এখন এক নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে-ছেন। সে আশাভরসার পরিবর্ত্তে এখন তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যের বিষম আঘাতে একবারে শতধা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিঃপ্রকাশ এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেন এমন হলো?"

ঠিক্ এই সময়ে আর এক ব্যক্তি সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্যোতিঃ-প্রকাশ তখন সেই নবাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহারই সম্মুখস্থ চেয়ারে তাঁহাকে বসাইলেন। নবাগত ব্যক্তি জ্যোতিঃপ্রকাশের মুখের প্রতি একবার চাহিয়াই বলিলেন "কি—হে? তোমার চেহারা এমন কেন? তোমার কোন অসুখ করেছে না কি?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমার শারীরিক কোন অসুখ নাই, কিন্তু ভাই নগেন, আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত—আমার স্ত্রীর বড় অসুখ; এখন সেই জন্যেই তোমায় ডেকেছি।"

নগেন্দ্রনাথ সরকার কলিকাতার এক-জন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ডাক্তার, এবং জ্যোতিঃ প্রকাশের বিশেষ বন্ধু। জ্যোতিঃপ্রকাশের

এই কথায় বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন—"সে কি! এরই মধ্যে তাঁর আবার কি অসুখ হয়েছে?"

জ্যোতিঃ। অসুখ যে কি তা ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কিন্তু যেরূপ লক্ষণ দেখ্‌ছি—তাতে তার জীবন যে সঙ্কটাপন্ন—তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

নগেন্দ্র। এমন কি লক্ষণ দেখেছ—আমায় সব খুলে বল।

জ্যোতিঃ। প্রথমতঃ সেই বিবাহের রাত্রে, আমার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ কর্‌লে না; সমস্ত রাত্রি ধরে কত রকম চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই তার মুখে একটীও কথা শুন্‌তে পেলেম না। পরদিন সকালে উঠে দেখি—বিনোদিনীর চক্ষু রক্তবর্ণ; তখনও মুখে কোন কথা নাই। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ রক্তবর্ণ চক্ষে যখন আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চাহিয়া রহিল, তাহার সে চাহনি দেখে, তখন আমার গায়ের রক্ত শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো। ভূতযোনিতে আমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু আমাদের ঝি বলিল—"নিশ্চয় বিনোদিনীকে ভূত পেয়েছে।" সেই দিন রাত্রেও আমরা এক শয্যায় শুইয়া রহিলাম। শয্যায় সমস্ত রাত্রি বিনোদিনী কেবল ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, মুহূর্ত্তের জন্যেও নিদ্রা গেল না। আমি তাহার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম—ভয়ঙ্কর উত্তাপ। তৎক্ষণাৎ মনে কর্‌লাম—জ্বর হয়েছে। আমি তার গায়ে হাত বুলাইতে লাগ্‌লাম। ৪।৫ মিনিটের পরে দেখি—ক্রমে ক্রমে সেই উত্তাপের হ্রাস হয়ে, সে গা যেন একবারে বরফের মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি সমস্ত রাত্রি পরীক্ষা করে দেখেছি—আমি গায়ে হাত দিলেই, সে গা বরফের মতন ঠাণ্ডা হয়, আর আমি হাত উঠিয়ে নিলে, গা ক্রমে ক্রমে গরম হতে থাকে। আমি যদি কিছুক্ষণ এইরূপ তাকে স্পর্শ করে থাকি, তবে বোধ হয় কোলাপ্স (colapse) হয়ে, নিশ্চয় তার মৃত্যু হয়। প্রাতে উঠে দেখি—চক্ষু আর সে রকম রক্তবর্ণ নয়, কিন্তু শরীরে রক্তের চিহ্ন কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না—সমস্ত শরীর যেন পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে; এত দুর্ব্বল যে দেখে আমার ভয় হলো। আমি তোমায় ডাক্‌বো মনে কর্‌ছি—কিন্তু আমাদের ঝি বাড়ীর মেয়েদের কি বুঝিয়েছে জানি না, তাদের অনুরোধে তোমায় না ডেকে, এক ভূতের ওঝাকে ডেকে আনা হয়েছিল! তার কার্য্য দেখে আমি আশ্চর্য্য হলে গেলাম। ভূতযোনিতে আমার বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তখন আমারও সে বিশ্বাস হলো।

এই ডাক্তার বাবু জ্যোতিঃপ্রকাশের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"কিসে সে বিশ্বাস হলো?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সেরূপ দুর্ব্বল রোগী দুটি সরিষা-পড়ার আঘাতে এরূপ বিক্রম প্রকাশ কর্‌তে লাগলো যে, তখন তাকে ধরে রাখা ভার হলো।"

নগেন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত কহিলেন—"তার পর—তার পর?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"তার পর এক খানা পোড়া হলুদ নাকের কাছে ধরিবামাত্র মুখে কথা ফুট্‌লো। সেই বিবাহের পর বিনোদের মুখে একটীও কথা শুন্‌তে পাই নাই। সেই কারণ তাহার কথা শোন্‌বার জন্যে আগ্রহের সহিত আমিও সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু সে কথা শুনে আমার হৃদ্‌কম্প হলো। সে কণ্ঠস্বর এত কর্কশ যে, বিনোদের কণ্ঠস্বর বলে আমার বিশ্বাস

হলো না। সেই কর্কশ স্বরে তখন সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলো কি বল্লে জান—"কেন একে এখানে তোমরা আন্‌লে? এ যেখানে ছিল—সেই মহেশপুরে একে রেখে এসো—নইলে তোমাদের ভাল হবে না, একজনও প্রাণে বাঁচবে না।" আমি অবাক্ হয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম—আমার উপর ঝঙ্কার করে উঠ্‌লো—"মনে করেছ বিনোদকে তুমি বিয়ে করেছ—বিনোদ তোমার হবে? বিনোদ কখনই তোমার বিনোদ হবে না। সে দুর্গাবতী হয়ে—চিরকাল আমার থাক্‌বে। তাকে এখনই রেখে এসো—এখনই রেখে এসো!" আমি ত অবাক্! সে ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর এখনও যেন আমার কাণে বাজ্‌ছে। সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এখনও যেন আমি স্বচক্ষে সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্ছি; বিনোদের সে সুন্দর চক্ষু দেখে আমি একবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম, এখন সে চক্ষু দেখে, আমার প্রাণ ভয়ে আকুল হয়ে উঠ্‌লো। ভূতযোনিতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল।

নগে। তার পর—ওঝা তখন কি কর্‌লে?

জ্যোতিঃ। আমার ত সে ভূত তাড়াবার কোন ভরসাই ছিল না, কিন্তু ওঝা এই সময় আমায় বিশেষ ভরসা দিল এবং পুরস্কারের বন্দোবস্ত কর্‌লো। তার পর ওঝার মন্ত্রপূত সরিষার আঘাত রোগীর অসহ্য হলো। রোগী অনেক যন্ত্রণাসূচক শব্দের সহিত তখনই যেন পালাই পালাই ডাক্ ছাড়িতে লাগ্‌লো। ওঝা এই সময় এক কলসী জল আনিতে বলিল। তখন সেই জলপূর্ণ কলসী দাঁতে করে নিয়ে যেতে ওঝা আজ্ঞা কর্‌লো। আমাদের সকলের সম্মুখে রোগী জলপূর্ণ একটা বড় কলসী দাঁতে করে নিয়ে ঘরের বাহিরে গেল। সেখানে কলসী রেখে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমরা অনেক যত্নে তার মূর্চ্ছা ভঙ্গ কর্‌লাম। বিনোদিনীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে, সে সলজ্জভাবে হিন্দুঘরের বধূর ন্যায় ঘোমটা দিয়ে একস্থানে বসে রইলো। ভূত ছেড়ে গেছে ভেবে, আমরা মহা আনন্দে তখন ওঝাকে যথোচিত পারিতোষিক দিয়ে বিদায় করে দিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর এক কাণ্ড হলো—আমি সবে মাত্র ঘরের মধ্যে গিয়েছি—এমন সময় বিনোদিনীর বিকট হাসিতে সে ঘর যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আমি সেরূপ ভয়ঙ্কর হাসি জীবনে কখন শুনি নাই। সে হাসি শুনে আমার প্রাণের ভিতর গুর্ গুর্ করে উঠলো—আমি ভয়ে আর ঘরের মধ্যে গেলাম না। আমি ঘরের বাহিরে এলেই বিনোদিনী দৌড়ে, সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সেই যে দরজার খিল দিল, রাত্রের মধ্যে আর দরজা খুল্‌লো না। কিছু ক্ষণ পরে সে হাসি থাম্‌লো বটে, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তখন কান্না আরম্ভ হলো—এইরূপ হাসি কান্নার সমস্ত রাত্রি কেটে গেছে। সকাল বেলা দরজা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, কিন্তু সে ঘরের মধ্যে যেতে আর কারু সাহস হয় না। আবার কি ভূত এসে উপস্থিত হলো—না এ একটা পীড়ার লক্ষণ—আমি কিছু স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না। তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

নগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমি রোগীকে একবার দেখে আসি, তার পর বল্‌বো।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল—"তুমি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে এসো—আমার আর সেখানে যেতে সাহস হচ্ছে না। যদি ভূতই হয়, তা হলে আমার উপরেই সে ভূতের জাতক্রোধ দেখ্‌ছি।"

র বাবু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন —"তোমার ভূতপ্রেত কিছুই নয়, এ এক প্রকার পীড়াই বটে। ডাক্তারেরা এ রোগকে (melancholia) মিল্যাংকোলিয়া বলেন; আর এ দেশের কবিরাজেরা একে বায়ুরোগ বলে থাকেন।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন —"হঠাৎ এ রোগ কি করে হলো? এ রোগ জন্মাবার কারণ তুমি কি অনুমান কর?"

নগেন্দ্র। কোন মর্ম্মান্তিক মনোকষ্ট বা শোক পেলে এ রোগ জন্মাতে পারে। বিনোদিনী সম্বন্ধে সেরূপ কোন কারণ বর্ত্তমান আছে কি?

জ্যোতিঃ। সে কারণ যে একবারে নাই, তাও নয়। বিনোদিনীর জ্যাঠা মহাশয় তাকে এতকাল লালন পালন করতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার দরুণ যে এতদূর হবে, তা আমার বোধ হয় না। সে যেমন একটু শোকের কারণ বটে, কিন্তু সে শোক অপেক্ষা আহ্লাদের কারণও সহস্রগুণে অধিক আছে। প্রথমে সেই জ্যেঠা মহাশয়ের মৃত্যুতে বিনোদিনী লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছে। তার পর, সে তখন এক পল্লীগ্রামে অতি হীনাবস্থায় ভয়ঙ্কর পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মধ্যে প্রতিপালিতা হচ্ছিল, তার পরিবর্ত্তে এখন এই কলিকাতাসহরে আমাদের সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ নবীনগোপাল বাবুর গৃহে এই কন্যারত্ন জননী উন্নতমনা হৈমবতী কর্ত্তৃক অতি যত্নে ও আদরের সহিত প্রতিপালিত হতেছে। বিনোদিনীর আরো আনন্দের কারণ আছে—তারই মনোমত পাত্রে তার জনকজননী তাকে সমর্পণ করেছেন। বিবাহের দিন বিনোদিনী যেরূপ আমার প্রতি তার আন্তরিক প্রণয় প্রকাশ করেছে, তাতে উপস্থিত সমস্ত ভগিনীগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন! আরো শুনেছি —অনেকেই সে সম্বন্ধে সে সময় হিংসা-প্রকাশও করেছিলেন! সেই জন্যেই বলছি—মর্ম্মান্তিক মনোকষ্ট বা শোকের অপেক্ষা অত্যন্ত আহ্লাদের কারণ বরং যথেষ্ট আছে। কিসে কি হলো—কিছুই ত বুঝ্তে পাচ্ছি না।

নগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তা অতিরিক্ত আনন্দ হলেও এ রোগ জন্মায়। আমার বেশ স্মরণ হচ্ছে— আমি Lancet পত্রে এইরূপ একটি ঘটনার কথা পড়েছি।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ তখন কহিল—"ভাই, তোমার কথায় আমার একটা দুর্ভাবনা গেল। এখন অতিরিক্ত আনন্দের জন্যেই বিনোদিনীর এই ভয়ঙ্কর রোগ জন্মেছে— সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা বিষয় এখনও আমার সন্দেহ আছে। সেই ভৌতিক কাণ্ডটা যে কি—তাত আমি এখনও বুঝ্তে পারছি না।"

ডাক্তার বাবু উত্তর ক[illegible]ন—"সেও এই রোগেরই কার্য্য। [illegible] রোগগ্রস্ত রোগী এর চেয়ে আরো অনেক বিস্ময়জনক কার্য্য করতে পারে। ওঝারা কেবল কৌশলে তাদের মনোমত কথা রোগীর মুখ দিয়ে বলায়, আর তাদেরই মনোমত কার্য্য রোগীর দ্বারা করিয়ে নেয়। ভূতপ্রেত সকলই মিথ্যা।"

জ্যোতিঃ। সে তর্ক তোমার সঙ্গে পরে করবো। এখন কিন্তু এ রোগ কিসে আরাম হয়—তার ব্যবস্থা কর।

নগেন্দ্র। বিশেষ যত্ন করলে, এ রোগ আরাম হতে পারে। কিন্তু সে হঠাৎ হবে

না, কিছু সময় লাগ্‌বে। এখন আমি যে ঔষধ দিচ্ছি, তাই খাওয়াও। আর কেবল ঔষধ খাওয়ালে হবে না—যাতে নিয়মিত সময় স্নানাহার করে, রাত্রে যাতে ভাল নিদ্রা যায়, সে ব্যবস্থাও তোমায় কর্‌তে হবে। এইরূপ নিয়মে ৩।৪ মাস থাক্‌লে তবে আরাম হতে পারে।

জ্যোতিঃ। আচ্ছা, আমায় দেখ্‌লে রোগের যখন বৃদ্ধি হয়, তখন আমার নিকটে যাওয়া কি উচিত?

নগেন্দ্র। তা নাই বা গেলে। তবে আমি যে রকম বল্লুম—সে রকম কাজ হলেই হলো।

এই কথা বলিয়া ডাক্তার বাবু ঔষধ লিখিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশ সে ঔষধ আনাইতে তাড়াতাড়ি লোক পাঠাইয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনীর পীড়ার সংবাদ তাহার পিতা নবীনগোপাল ও মাতা হৈমবতীর নিকট পৌঁছিল। সে ভয়ঙ্কর সংবাদ তাঁহাদের পক্ষেও হরিষে বিষাদ হইল। তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। যে সময় তাঁহারা জ্যোতিঃপ্রকাশের গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন গৃহাবদ্ধা বিনোদিনী উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া পৃষ্ঠাবলম্বিত তৈলহীন উন্মুক্তবেণী এলাইয়া দিয়া উন্মত্তভাবে গাহিতেছিল :—

"সেই আস্‌বে বলে গেল কালা,
এলো না—এলো না—এলো না গো,"

গানের এই অংশটুকু শেষ হইতে না হইতেই বিনোদিনী অন্য সুরে অন্য এক গানের এই অংশ মাত্র ধরিল :—

"মনে করি ভুলে থাকি,
ভোলা নাহি যায় সখি।"

গানের এই অংশটুকু শেষ হইতে না হইতে বিনোদিনী এবার গান থামিয়া কান্না আরম্ভ করিল। সে কান্নার মধ্যেও সুর ছিল, নৈরাশ্যে যে তাহার প্রাণ দগ্ধ হইতেছে—সেরূপ মর্ম্মান্তিক কথাও তাহাতে যথেষ্ট ছিল।

এই সময় একজন পরিচারিকা বিনোদিনীকে কহিল—"এদিকে একবার চেয়ে দেখ—তোমার যে মা এসেছেন।"

"মা এসেছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র বিনোদিনীর সে কান্না তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। বিনোদিনী উন্মত্তভাবপূর্ণ বিস্ফারিত নয়নে চারিদিক দেখিতে দেখিতে একটা বিকট চীৎকার করিল—"কোথা মা আমার—কোথা মা আমার—কোথা মা আমার!"

পরিচারিকা এই সময় পুনরায় বলিল —"এই যে তোমার মা, তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

বিনোদিনী বিস্ফারিতলোচনে কিছুক্ষণ হৈমবতীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পর ভীতিব্যঞ্জকস্বরে কহিল—"না—না—না। এত আমার মা নয়, আমার মা স্বর্গে গেছে! এ যে রাক্ষসী—আমায় খেতে এসেছে। তোমরা আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও।"

কন্যার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হৈমবতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভৃতির অভিমান দূরে গেল, তখন তিনি অশিক্ষিতা হিন্দু-স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন! সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া নবীনগোপালেরও চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। জনক-

জননীকে এইরূপে কাঁদিতে দেখিয়া, হঠাৎ বিনোদিনীর যেন একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইল। বিনোদিনী যেন অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"কিছু মনে করিস্ না মা—কিছু মনে করিস্ না। আমার কি মনের ঠিক আছে—না মাথার ঠিক আছে? আগে সে আসুক—আমার মন ভাল হ'ক, তখন কত ভাল কথা শোনাবো মা—কত ভাল কথা শোনাবো।"

এই সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ সেইখানে উপস্থিত হইয়া নবীনগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনোদিনীকে কিরূপ দেখ্‌লেন?"

নবীনগোপাল চক্ষের জল মুছিয়া উত্তর করিলেন—"বিনোদিনীকে আর কিরূপ দেখ্‌বো? আর কি আমার সে বিনোদিনী আছে—এখন যাকে দেখ্‌ছি—এত উন্মাদিনী।"

বিনোদিনী সে কথা শুনিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমি বিনোদিনী নই—বিনোদিনী কখনই নই। পূর্ব্বে ছিলাম দুর্গাবতী, এখন হয়েছি উন্মাদিনী—যথার্থই আমি উন্মাদিনী।"

তার পর জনকজননী ও জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে কহিল—"কিন্তু তোমরাই আমায় উন্মাদিনী করেছ—তোমরাই এ উন্মাদিনী হবার মূল।"

নবীনগোপাল তখন চক্ষের জল মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বহুকষ্টে কহিল—"কেন মা, কিসে তোমায় আমরা উন্মাদিনী কর্‌লুম? তোমায় মহেশপুর থেকে নিয়ে আসা পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যেও কোনরূপ অযত্ন করি নাই।"

উন্মাদিনী উন্মত্তস্বরে উত্তর করিল—"আমি তোমাদের সে যত্ন চাই না—চাই না—চাই না। আমার যে যত্ন বরবার, সে যত্ন কর্‌লো না কেন? তোমরা আমায় নিয়ে এলে, আর কেন তাকে নিয়ে এলে না—কেন তাকে কোন সংবাদ দিলে না?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ নবীনগোপালের মুখের প্রতি চাহিয়া বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কে?"

নবীনগোপাল বিষণ্ণ মনে উত্তর করিলেন—"কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

তখন সেই উন্মাদিনী চীৎকার করিয়া উঠিল—"সে আমার জীবিতেশ্বর—সে আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পুনরায় নবীনগোপালের মুখের প্রতি চাহিলেন,—নবীনগোপাল পূর্ব্বের ন্যায় বিষণ্ণ মনে কহিলেন—"পাগলের প্রলাপ।"

এই সময় নগেন্দ্র বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া উন্মাদিনী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া লজ্জায় যেন জড়সড় হইল। তার পর একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—"ওমা! কি লজ্জা—কি লজ্জা—এই যে তিনি এসেছেন! তা আমি ত কথা কবো না।"

এই কথা বলিয়া উন্মাদিনী নিশ্চল ও লজ্জাবনতমস্তকে সেই স্থানে দাঁড়াইল। তার পর পুনরায় সেইরূপ সলজ্জভাবে বলিতে আরম্ভ করিল—"ওমা! কোথা যাবো! কেউ একবার বস্‌তেও বল্‌লে না গা! কতকাল পরে এলো—তা কেউ একবার আদরও কর্‌লে না গা!"

সেই পরিচারিকা তখন বলিল—"ও দিদি বাবু এ যে ডাক্তার বাবু তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন।"

সে কথা শুনিয়া উন্মাদিনী সে অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"ডাক্তার বাবু, তোমার কাছে নাকি বিষ

থাকে? আমি ও অষুধ খাবো না; আমায় বিষ দিও—খুব বেশী করে দিও।"

নগে। তুমি বিষ খাবে কেন?

উন্মা। বড় জ্বালা—বড় যন্ত্রণা; দেখ, প্রাণের জ্বালা আর মাথার যন্ত্রণা। সব জ্বলে গেল—জ্বলে খাক্ হয়ে গেল।

নগে। আচ্ছা, সে সব আমি ভাল করে দেবো।

উন্মাদিনী এই কথায় উন্মত্তভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কি! তুমি সব ভাল করে দেবে! তুমি তাকে এনে দেবে? অষুধে হবে না—তোমার ও অষুধে হবে না। তাকে এনে দাও, আমার সব জ্বালা ভাল হবে।"

এই সময় উপস্থিত সকলে ডাক্তার বাবুর মুখের প্রতি আগ্রহের সহিত চাহিল। ডাক্তার বাবু ইঙ্গিতের দ্বারা কাহাকে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন—"সে তোমার কে?"

উন্মাদিনী বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রনাথের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টে চাহিয়া রহিল! যেন কি একটা পূর্ব্বকথা এই সময় স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তার পর অতি ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বলিল—"সে আমার কে হয়—তা জানি না। কিন্তু তাকে সর্ব্বদাই মনে হয়—একটু একটু মনে হয়। সে আসে, আবার চলে যায়। সে কখন্ আসে—কখন্ যায়, জানি না। তাকে এত ধর্‌তে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না।"

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী চীৎকার করিয়া উঠিল—"এবার ধরা পেলে, আর ছেড়ে দেবো না—আর ছেড়ে দেবো না।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ এই সময় ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাই মশায়, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে কি?"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"একজনের জন্যে এর নিশ্চয়ই প্রাণ কাঁদ্‌ছে, কিন্তু সে যে কে—তা ত বুঝ্‌তে পারলুম না।"

নবীনগোপাল কহিলেন—"বোধ হয়, আমার মৃত দাদার উদ্দেশে এই সকল কথা বল্‌ছে।"

এই সময় সেই পরিচারিকা বলিল—"না গো না—তোম্‌রা বুঝ্‌তে পার না—এ সব কথা সেই ভূতটার জন্যে হচ্ছে। ওঝা মিন্সে ভূত ছাড়িয়ে দিয়েছে বলে, এখন তাকে এনে দাও—তাকে এনে দাও কর্‌ছে; আমরা ঢের দেখেছি—এ সব খুব বুঝ্‌তে পারি।"

তখন ডাক্তার বাবু কহিলেন—"থাক্ ও সকল কথা। এখন রোগীকে এরূপ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ উত্তর করিলেন—"পালিয়ে যাবার ভয় আছে বলে।"

নগে। ঘর খুলে দাও—এ রকম ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হবে না; ওর যে কোন ব্যারাম হয়েছে—এ কথাটা উনি যত না বুঝ্‌তে পারেন, ততই ভাল। লোকের বন্দোবস্ত করে দিও—তা হলে আর কি করে বেরিয়ে যাবে?

এই সময় উন্মাদিনী পুনরায় গান ধরিল:—

"আমার পালাই পালাই করে প্রাণ।
সত্য করে বল্ সজনি, আস্‌বে কি না গুণধাম॥
পলাইলে আর দেখা,
হবে কি না হবে সখা,
সেই ভয়ে আছি মরে এসে তুমি বাঁচাও প্রাণ॥"

এই গান শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। ডাক্তার বাবু এই সময় এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আহা! কণ্ঠস্বর অতি মধুর। যদি এরূপ রোগগ্রস্ত না হতো, তবে ইনি নিশ্চয়ই আমাদের সমাজের মুখ উজ্জ্বল করতেন।"

তার পর সে গৃহের দরজা খোলা হইলে ডাক্তার বাবু ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াই রামগোপালের মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। আরো শুনিলেন—দুর্গাবতীকে তাহার পিতা আসিয়া কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎক্ষণাৎ এলাহাবাদে খগেন্দ্রনাথকে এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে সমস্ত সংবাদ খুলিয়াও লেখা হইয়াছিল। খগেন্দ্রনাথ সেই পত্র পাইবামাত্র এলাহাবাদ হইতে তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় রহনা হইলেন। তিন দিনের দিন তিনি মহেশপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আপনার উপর এখন আমার জীবনমরণ নির্ভর করছে। আপনি ভিন্ন আমার বিবাহের কথা আর কেউ জানেন না। এখন আপনি আমার জীবন রক্ষা করুন।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন—"তার জন্যে চিন্তা কি? তোমার বিবাহের আমি প্রধান প্রমাণ রয়েছি। তা ছাড়া আমার অন্য প্রমাণও আছে। তবে সে সময় উপস্থিত না থাকায়, আমি বরং তোমার কাছে বড় লজ্জিত হয়ে আছি। যা হক, আজই আহারান্তে চল, আমরা কলিকাতায় যাই। সেখানে নবীনগোপালকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বল্‌বো।"

সেই দিন আহারান্তে তর্কালঙ্কার মহাশয় খগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় রহনা হইলেন। সেই দিন রাত্রেই তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিলেন। সে রাত্রে নবীনগোপালের আর কোন অনুসন্ধান করা হইল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় সে রাত্রে তাঁহার একজন শিষ্যের বাসায় গিয়া রহিলেন। পরদিন প্রত্যূষে খগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া নবীনগোপালের ঠিকানায় উপস্থিত হইলেন। নবীনগোপালের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না, তিনি প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন। নবীনগোপাল সে পরিচয় পাইয়া বলিলেন—"আপনার মাতুলকে আমি চিনিতাম, কিন্তু আপনাকে পূর্ব্বে কখন দেখেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন—"পূর্ব্বে আমি মাতুলালয়ে থাক্‌তাম না, এখন আমার মাতুলের মৃত্যু হয়েছে—তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি না থাকায়, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও যজমান সকল এখন আমারই হয়েছে। এখন আমি আপনাদের কুল-পুরোহিত হয়েছি।"

নবীন। আপনার এখানে আসার কি উদ্দেশ্য বলুন। কুল-পুরোহিত বলে, আমি আপনাকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নই।

তর্কা। আপনার জ্যেষ্ঠ আমায় কুল-পুরোহিত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা হলেও আমি কোনরূপ প্রভুত্ব করতে আপনার নিকট আসি নাই; কারণ আপনার নিকট সে সম্মান যে পাবো না, তা আমি জানি। তবে আমি আপনার কন্যার বিবাহ দিয়েছি—সে জামাতার সঙ্গে

আপনার কোন পরিচয় নাই; আমি কেবল সেই পরিচয় দিতে এখানে এসেছি। এই আপনার সেই জামাতা—দুর্গাবতীর স্বামী।

এই কথা বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় খগেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিলেন। নবীনগোপাল বিস্মিত হইয়া খগেন্দ্রনাথের প্রতি একবার চাহিলেন; তার পর তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কহিলেন—"আপনার কথা ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমার জামাতা কি রকম?"

তর্কা। আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর এই ব্যক্তির সহিত আপনার কন্যা দুর্গাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

নবীনগোপাল এবার অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি! আমি সে সংবাদ ত কিছুই জানি না।"

তর্কা। আপনি অল্পবয়সে হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত ছিলেন বলে আপনাকে গোপন করে এ বিবাহ দেওয়া হয়।

নবীন। আর কেহ এ বিবাহের কথা জানেন?

তর্কা। আমি জানি—আর যিনি জানিতেন, তিনি ত স্বর্গে গিয়েছেন। এখন আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না।

নবীন। আমি তবে আপনার কথা কি করে বিশ্বাস কর্‌বো? এই কন্যার জন্যে আমার ভ্রাতা কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন, যদি সেই সম্পত্তির লোভেই কোনরূপ ষড়যন্ত্র হয়?

তর্কা। আমার অন্য প্রমাণও আছে। আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরের হস্তাক্ষর দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বেন কি?

নবীন। নিশ্চয়ই পার্‌বো।

তর্কা। তবে এই পত্রখানি পাঠ করুন।

এই বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় একখানি পত্র নবীনগোপাল বাবুর হস্তে দিলেন। নবীনগোপাল কম্পিতহৃদয়ে সে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। সে পত্রে এইরূপ লেখা ছিল:—

কল্যাণবরেষু—

এই পত্র আমার মৃত্যুর পর তোমার হস্তগত হইবে—এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম। কারণ, এ পত্রে যে সংবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা তোমার প্রীতিকর হইবে না। আমি তোমায় কিরূপ স্নেহ করি, তাহা আমি আর এই পত্রে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার জীবদ্দশায় তোমার সহিত আমার কোন প্রকার মনান্তর না হয়, আমার তাহাই ইচ্ছা। এই জন্যে একটি কথা তোমার নিকট গোপন রাখিয়াছিলাম। সে কথাটি এই—আমি গোপনে হিন্দুমতে তোমার কন্যার বিবাহ দিয়াছি। কন্যা তোমার হইলেও দুর্গাবতীকে আমি কিরূপ স্নেহ করি, তাহা তুমি জান। আমার বিশ্বাস মতে আমি এ কার্য্য ভালই করিয়াছি। এই ঘটনায় তুমি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইবে—তাহা আর আমি দেখিতে আসিব না। যে পাত্রে দুর্গাবতীকে অর্পণ করিলাম, তাহাতে যে সে সুখী হইবে—ইহাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তুমিও শুনিলে সুখী হইবে যে, আমি দুর্গাবতীরই মনোমত পাত্রে তাহার বিবাহ দিয়াছি। পাত্র আমারই পরমবন্ধু মৃত আশুতোষ বাবুর পুত্র—খগেন্দ্রনাথ। তোমার অসম্মতিক্রমে এই বিবাহ সম্পন্ন করাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সে দোষ অন্য কাহারও নহে—সে দোষ আমার। আমায় জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানে ইহার জন্যে কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হইও না—আর তোমার কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিও—এই আমার শেষ অনুরোধ। এই পত্রবাহক তর্কালঙ্কার

মহাশয় কিম্বা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার কোন প্রতিনিধি ব্যতীত এ বিবাহের কথা আর কেহ জানেন না। এ সম্বন্ধে তোমার কোন প্রশ্ন থাকিলে, ইনি তাহার উত্তর দিবেন। ইতি— আশীর্ব্বাদক।

শ্রীরামগোপাল শর্ম্মা।

পত্রখানি পাঠ করিতে করিতেই নবীনগোপালের মাথায় যেন অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—"কেমন—এখন আপনার আমার কথায় বিশ্বাস হয়েছে কি?"

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া নবীন-গোপাল কহিলেন—"আপনি এতদিন আমায় এ পত্র দেন নাই কেন?"

তর্কা। তোমার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর সময় আমি গ্রামে ছিলাম না। আমি সেই সময় আমার কোন শিষ্যের বাড়ী যাই। সেখানে পীড়িত হয়ে, প্রায় তিন সপ্তাহকাল শয্যা-গত থাকি। গ্রামে এসে এই সংবাদ পেলাম; এলাহাবাদে পত্র লিখে খগেন্দ্র-নাথকে আনিতেও এক সপ্তাহ বিলম্ব হয়ে গেছে; কাল খগেন্দ্রনাথ আমার বাড়ী এসে পৌঁছিয়াছে, আর আজ আমি তোমার নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছি।

নবীনগোপালের মুখে আর কথা নাই। তিনি এ সময় কি কথা কহিবেন—তাহার স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় তর্কালঙ্কার মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আপনার আর কোন সন্দেহ নাই ত?"

নবীনগোপাল অন্যমনে বলিলেন—"এখন সন্দেহ থাক্‌লেও বা, না থাক্‌লেও তাই। আমি যে সে কন্যার ব্রাহ্মমতে পুনরায় বিবাহ দিয়েছি।"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ বলি-লেন—"সে কি! আপনি এরূপ ভয়ানক পাপকার্য্য কিরূপে কর্‌লেন?"

খগেন্দ্রনাথও সেই ভয়ঙ্কর কথা শুনিবা-মাত্র একবারে শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে উন্মত্তভাবে একবার নবীনগোপালের ও একবার তর্কালঙ্কারের মুখের প্রতি—এইরূপ বারম্বার চাহিতে লাগিলেন। মুখে কোন কথাই তখন বলিতে পারিলেন না।

এ দিকে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথার উত্তরে নবীনগোপাল উত্তর করিলেন—"আমি এ কার্য্য পাপকার্য্য বলে মনে করি না।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় এবার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"বিবাহিতা কন্যার পুন-রায় যখন বিবাহ দিয়াছেন—তখন সেটা পাপকার্য্য নয়,—কি করে বল্‌ছেন?"

নবীনগোপালও এবার ক্রোধভরে বলিলেন—"হিন্দুমতে বিবাহকে আমরা বিবাহের মধ্যে গণ্য করি না।"

তর্কা। আপনি না কর্‌তে পারেন, কিন্তু পৃথিবীশুদ্ধ লোক করে। হিন্দু-বিবাহ আপনাদের বিবাহের মতন কেবল মনের মিলন বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া নহে, এ বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধ ইহকালে—কি পরকালে—কিছু-তেই বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আপনি কেমন ক'রে আপনার কন্যাকে সে গুরুতর সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন কর্‌বেন?

নবীন। আমার কন্যার বিবাহ আমি ভিন্ন আর কাহার দিবার অধিকার নাই।

তর্কা। সেটা আপনার ভুল। আপ-নার কন্যাকে যে আপনার কন্যার ন্যায়ই লালনপালন করেছেন—আপনার সেই

জ্যেষ্ঠ সহোদরের সে অধিকার সম্পূর্ণ আছে। সে বিবাহ যথার্থ ধর্ম্মসম্মত হয়েছে কি না, সে কথা আপনার কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করুন?

নবীন। আমার কন্যা এখন বায়ু-রোগগ্রস্তা, তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আর উপায় নাই।

তর্কা। তবে আপনিই তাহার এই বায়ুরোগের কারণ—এই ভয়ঙ্কর পাপ কার্য্যই সে বালিকাকে উন্মাদিনী করেছে।

এই কথায় নবীনগোপালের মনে কি উদয় হইল জানি না, কিন্তু নবীনগোপাল এই সময় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্নমনে কহিলেন—"যা হবার হয়ে গেছে—এখন তার আর উপায় নাই।"

এই সময় খগেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর যাহা হইতেছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম। এতদিন পরে দুর্গাবতীকে পাইয়া তিনি কত আনন্দ করিবেন—মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে—এ কি ভয়ঙ্কর সংবাদ। এ সংবাদ যে কখন মনেও ধারণা করা যায় না—স্বচক্ষে দেখিলেও যে বিশ্বাস হয় না। খগেন্দ্রনাথ অনেক সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"ইহা স্বপ্ন—না সত্য?"

কিন্তু স্বপ্নই হউক, আর সত্যই হউক—খগেন্দ্রনাথ তখন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুখে কোন কথা বলিতে পারিতেছিলেন না—কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতর ভীষণ আগুন জ্বলিতেছিল। দুর্গাবতী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে—এই সংবাদে এখন তাঁহার কতক বিশ্বাস জন্মিল। দুর্গাবতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে এই কার্য্য হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন—তখন ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। খগেন্দ্রনাথ সক্রোধে বলিলেন—"আপনি এরূপ ভয়ঙ্কর কাজ কি করে করলেন?"

খগেন্দ্রনাথের এইরূপ ক্রোধযুক্ত কথা শুনিয়া নবীনগোপালের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে এই সময় দুই-চারি কথা বলিবারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু খগেন্দ্রনাথের তাৎকালীন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি মনে মনে ভীত হইলেন, এবং ধীরভাবে উত্তর করিলেন—"আমি কোন ভয়ঙ্কর কাজ করি নাই। নিজের কন্যার বিবাহ দিয়েছি—এ কাজ কিসে ভয়ঙ্কর হলো?"

খগেন্দ্রনাথ পুনরায় উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"আপনি আপনার বিবাহিতা কন্যার পুনরায় বিয়ে দিয়েছেন যে!"

নবীনগোপাল এবারও ধীরভাবে উত্তর করিলেন—"সে বিবাহের কথা আমার জানা থাকলে বোধ হয় পুনরায় এ কার্য্য না হবারই সম্ভব ছিল। কিন্তু আমি কি করবো? সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় এই সময় কহিলেন—"কিন্তু এই বিবাহের সময় আপনার কন্যার কি ইচ্ছা সেটা জানা হয়েছিল কি? আপনারা ত সে কার্য্য করে থাকেন শুনি।"

নবীন। সে বিষয়ের ভার আমার স্ত্রীর উপর দেওয়া ছিল। আমি নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই করি নাই। এখন সমস্ত বুঝতে পারছি—তাঁরও বুঝবার ভুল হয়েছে। এখন এ সকল কথা শুনলে তিনিও নিশ্চয়ই অনুতাপ করবেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন—"কেবল অনুতাপ এ পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নয়। শাস্ত্রে এর কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে কি না, তাও আমি জ্ঞাত নই।"

নবীন। আর অধিক কথা আমায় বলবেন না। আমরা এ বিবাহ দিয়ে একদিনের জন্যেও সুখী হই নাই। দুর্গাবতীর অবস্থা দেখে আমাদের প্রাণ ফেটে যাচ্ছে; এই বিবাহ দেওয়াতেই যে তার এই অবস্থা হয়েছে—আপনার নিকট এই কথা শুনে, এতক্ষণের পর তা বুঝ্‌তে পেরেছি।

এই সময় খগেন্দ্রনাথ তর্কালঙ্কারের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন; তর্কালঙ্কার মহাশয় পুনরায় কহিলেন—"আপনার কন্যার সঙ্গে আমরা একবার দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করি।"

নবীন। আমার কন্যা এ বাড়ীতে নাই; যাহার সহিত তার বিবাহ দিয়েছি—সেই জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবুর বাড়ীতেই আছে। এখন তার যে অবস্থা, তাতে তার সঙ্গে দেখা করা আর না করা উভয়ই সমান।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তখন জ্যোতিঃপ্রকাশের ঠিকানা জানিয়া লইয়া খগেন্দ্রনাথের সহিত বিষণ্নমনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নবীনগোপালও বিষণ্নমনে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হৈমবতী তাহার সাধের কন্যা বিনোদিনীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এতকাল পরে কন্যাকে লাভ করিয়া তাঁহার মনে মনে যে আশা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নির্ম্মূল হইয়াছে। হৈমবতী কন্যার শোকে এখন বিশেষ শোকাতুরা—সেই কারণ আহারাদির প্রতিও এখন তাহার আর সেরূপ লক্ষ্য ছিল না। এই কারণ গ্রীষ্মের সময় তাহার পানীয় জলে ভৃত্যেরা বরফ না দিলেও হৈমবতী তাহার জন্যে এখন আর একটিও কথা বলিতেন না। চায়ে চিনি কম হইলেও হৈমবতী অম্লানবদনে তাহা পান করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে বায়ুসেবন হৈমবতীর দৈনিক কার্য্য ছিল, সে বায়ুসেবন পর্য্যন্ত হৈমবতী এখন এক প্রকার বন্ধ করিয়াছেন। বেহারা টানা-পাখা টানিতে টানিতে নিদ্রা যাইলেও—হৈমবতী এখন তাহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় তিরস্কার বা প্রহার করেন না। এমন কি—আহারান্তে দিবাভাগে অভ্যস্ত নিদ্রা পর্য্যন্ত হৈমবতী এই মনোকষ্টে ত্যাগ করিয়াছেন। হাজার হউক—মার প্রাণ ত!

আজ হৈমবতী নিদারুণ মনোকষ্টে আহারান্তে শয্যায় পড়িয়া কেবল ছট্‌ফট্ করিতেছেন—কোনমতে তাঁহার নিদ্রা হইতেছে না। একজন পরিচারিকা তাঁহাকে বাতাস করিতেছে—অন্যজন মাথায় একখানা বরফ ধরিয়া আছে—নিকটেই জনৈক সখী ল্যাভেণ্ডারের শিশি-হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় নবীনগোপাল সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্ত্রীর ঈদৃশ দশা দেখিয়া বড়ই মনোকষ্ট পাইলেন। ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন—"দুর্গাবতীর এরূপ রোগ হবার কারণ—"

তৎক্ষণাৎ স্বামীর কথায় বাধা দিয়া হৈমবতী বলিলেন—"তোমায়ও যে সেই রোগ এসে ধরেছে দেখ্‌ছি। তুমি কন্যার শোকে এত জ্ঞানহারা হয়েছ যে, তার নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছ!"

নবীনগোপাল পত্নীর কথায় যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যাক্—নামে কিছু এসে

যায় না; এখন আমার মনে বড় অনুতাপ হয়েছে। নগেন্দ্র ডাক্তার যে বলেছিল—অধিক আনন্দে দুর্গাবতীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে—সেটা তাঁর ভুল। দুর্গাবতী মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট পেয়েই উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়েছে। পূর্ব্বে দাদা তার হিন্দুমতে বিবাহ দিয়েছিলেন, আমরা আবার তার ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়েছি—ইহাই সে মনঃকষ্টের কারণ।"

হৈমবতী শুইয়াছিলেন, নবীনগোপালের এই কথায় হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"সে কি! আমাদের কন্যার হিন্দুমতে বিবাহ! চুপ কর—এ কথা যেন সমাজে প্রকাশ না হয়!"

নবীনগোপাল সে কথা শুনিয়া পত্নীর কথায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"সে কথা গোপন কর্‌বার জন্যে এখন তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? তোমার মতে কি সে বিবাহ হয়েছিল? এখন আমাদের এই কাজটা কত গর্হিত হয়েছে—সেই কথা বল্‌বার জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।"

হৈমবতী তখন বিস্মিত হইয়া কহিলেন —"কাজটা গর্হিত কিসে হলো?"

নবীন। এই কাজ করেইত আমরা কন্যাকে উন্মাদিনী করেছি। তার সে দিনকার সেই মর্ম্মান্তিক কথা কি তোমার মনে নাই? তখন আমরা সে সকল কথা প্রলাপ বলে অবজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু এখন সেই উন্মাদিনীর মর্ম্মস্পর্শী প্রলাপের কথা মনে হলে, আমার প্রাণ ফেটে যায়। আচ্ছা, তুমি কি পূর্ব্বে এর বিন্দুবিসর্গ জান্‌তে পার নাই?"

হৈম। জান্‌তে পার্‌বো না কেন?—তাই জেনেইত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলুম। তবে বিয়ে যে হয়ে গেছে—সে কথা আমি জান্‌তে পারি-নে। তাহার সঙ্গে নিশ্চয় প্রণয় হয়েছে, আমার এই সন্দেহ হয়েছিল। বিয়ে হলেই সে কথা ভুলে যাবে বলে, আমি তাড়াতাড়ি বিয়ের উদ্যোগ কর্‌লুম।

নবীন। এ কাজটা ভাল কর নাই।

হৈম। না কর্‌লে—যে টাকার মায়ায় কন্যাস্নেহ ভুলে এত কাল ওকে হিন্দুর ঘরে রেখেছিলুম সে টাকাও যে হাত-ছাড়া হয়। কোন হিন্দুর ছেলের সঙ্গে হিন্দুমতে বিয়ে হলে, এ টাকার ফল আমরা কি পেতুম? আর এতে সমাজেও তোমার মাথা হেঁট হতো। আর টাকাটাও কোন মতেই ঘরে রাখ্‌তে পার্‌তুম না। উইলের দোহাই দিয়ে জামাই সব হস্তগত কর্‌তো, আমার ছেলে পিলেকে কি আর কিছু দিত?

নবীন। টাকার জন্যে, কন্যাকে এরূপ উন্মাদিনী করা কি ভাল হয়েছে? তোমার কি এত টাকার লোভ? তোমার কি একটু দয়ামায়া নেই? তোমার মনে এর জন্যে একটুও কি কষ্ট হলো না—অনুতাপ হলো না?"

পতির উপরোক্ত কথায় তখন শিশিরাভিষিক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় হৈমবতীর মুখখানি গম্ভীর হইল। অভিমানে সে মুখ যেন ঢল ঢল করিতে লাগিল। হৈমবতী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া করুণস্বরে বলিলেন —"কি! আমার কষ্ট হয় নাই! আমি স্বচক্ষে বিনোদিনীর সেই মর্ম্মান্তিক কাণ্ড-কারখানা দেখে, সেইদিন থেকে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছি—আর তুমি বল্‌ছো—আমার কোন কষ্ট হয় নাই!—বল্‌না লো—তোরা ত সত্যিমিথ্যা রাতদিন দেখ্‌ছিস্, তোরা বল্‌না।"

এই বলিয়া সম্মুখস্থ সখী ও পরিচারিকা-দ্বয়ের উপর সে প্রমাণের ভার দিয়া হৈমবতী তখন চক্ষে রুমাল দিয়া কান্নাজুরক্ত-

মত কাঁদিতে বসিলেন। হৈমবতীকে কাঁদিতে দেখিয়া নবীনগোপালের মাথা ঘুরিয়া গেল। নবীনগোপাল তখন অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "তা তুমি যখন সে বিবাহের কথা পূর্ব্বে কিছুই জানতে পার নাই, তখন তুমি আর কি করবে—মেয়েটা সে সময় যদি এ সকল কথা প্রকাশ করতো। যাক সে কথা—এখন কন্যার সেই স্বামী এসে উপস্থিত হয়েছে—এদিকের অবস্থা ঐ—এখন করা যায় কি?"

হৈমবতী তখন অভিমানভরে কহিলেন,—"আমি তার কি জানি?"

নবীনগোপাল তখন বিস্মিতভাবে বলিলেন—"তুমিই সব জান। তোমার মত ভিন্ন আমি কি কোন কাজ করে থাকি?"

পতির এরূপ কথায় পত্নীর অভিমান আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? হৈমবতী তখন সঙ্গিনীগণকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"যাতে আমার বিনোদিনী ভাল হয়, আর সেই সঙ্গে তোমার দাদার সম্পত্তি সব আমাদের হাতছাড়া না হয়—এমন উপায় থাকে; এখনই কর; এতে সমাজে নিন্দে হবার ভয় করো না।"

নবীনগোপাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তবে তাই ভাল। আমি যে রকমে হ'ক, জ্যোতিঃপ্রকাশকে বুঝিয়ে সে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দেবো। আর সে এরূপ উন্মাদিনী স্ত্রী নিয়েই বা কি করবে? দুর্গাবতীকে প্রথমে ঘরে আনবো—তার পর অপর পক্ষেরা আমার কথা মত কার্য্য করতে রাজী হলে, তখন তাহাদিগকে কন্যা ছেড়ে দেবো।"

হৈমবতী মুখ নাড়িয়া বলিল—"আহা! তোমার যেমন বুদ্ধি! আগে সে বন্দোবস্ত কর—তার পর জ্যোতিঃপ্রকাশের সঙ্গে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে এসো। তা নইলে মেয়েও যাবে—সম্পত্তিও হাতছাড়া হবে।"

"আচ্ছা—তাই করবো।"—এই কথা বলিয়া নবীনগোপাল তখন জ্যোতিঃপ্রকাশের বাসার উদ্দেশে দ্রুতগতি প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জ্যোতিঃপ্রকাশ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আপনার কথায় আমার কোন অবিশ্বাস নাই। বরং অবস্থা দেখে, এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাসই হয়েছে।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—"তুমি এত সহজে বিশ্বাস করবে, তা আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই।"

জ্যোতিঃ। আমার এরূপ বিশ্বাস করবারও কারণ আছে। পূর্ব্ব হতেই এইরূপ একটা ঘটনার জন্য আমার সন্দেহ ছিল, এখন সে সন্দেহ দূর হলো। তবে আপনার কি বক্তব্য বলুন।

তর্ক। তোমাকে প্রশান্ত দেখ্‌ছি। তোমার কাছে আসবার পূর্ব্বে আমার যে ভয় হয়েছিল—এখন দেখ্‌ছি সে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা পাড়াগেঁয়ে হিন্দু, ব্রাহ্মদের কাছে আসতে আমাদের কেমন ভয় হয় বাপু। তার পর নবীনগোপাল বাবুর নিকট যে ব্যবহার পেয়েছি—তাতে সকল কথা বলতেও আমার ভয় হয়।

জ্যোতিঃ। নবীনগোপাল বাবু আপনাদের সঙ্গে কোন মন্দ ব্যবহার করেছেন না কি?

তর্ক। প্রথমে মন্দ ব্যবহারই করেছিলেন; কিন্তু শেষকালে একটু নরম হয়ে

গেলেন। আমি যখন জোর করে বল্লুম যে, তোমরাই তোমাদের কন্যার উন্মাদিনী হবার মূল, তখন কি বুঝে নবীনগোপাল একটু শান্তমূর্ত্তি ধর্‌লেন।

জ্যোতিঃ। আপনি তাঁকে যথার্থ কথা বলেছেন। আমি পূর্ব্বে সে কথা বুঝ্‌তে পারি নাই; কিন্তু এখন সেই পাগলিনীর সকল কথা—সকল কার্য্যই—স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এ বিবাহ করে আমি যে কি অন্যায় কাজ করেছি—তা আর মুখে বল্‌তে পারি না। মনে ভেবে দেখুন দেখি—কত মনঃকষ্ট পেলে তবে এরূপ উন্মাদ পাগল হয়। আপনারা যা বল্‌বেন—আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কিছুক্ষণ একমনে চিন্তা করিলেন; তার পর দুই একবার খগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। পুনরায় অল্পক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন—"কি আর বলবো মাথামুণ্ড? যখন সে কন্যাকে বিবাহ করে, তুমি ঘরে নিয়ে এসেছো, তখন তাকে আমরা ত ঘরে নিতে পার্‌বো না।"

জ্যোতিঃ। কেন পার্‌বেন না? আমি আপনার নিকট শপথ করে বল্‌ছি—এক মন্দিরে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ব্যতীত আর কোনরূপ স্ত্রী পুরুষ সম্পর্ক আমার সঙ্গে হয় নাই। আপনাদের দুর্গাবতী পূর্ব্বে যেরূপ পবিত্রা ও সতী ছিলেন, এখনও সেইরূপই আছেন।

তর্ক। তা হলেও এই বিবাহের কথা রাষ্ট্র হলেই আমাদের হিন্দুসমাজে নিশ্চয়ই এই কথা নিয়ে একটা গোলযোগ হবে।

জ্যোতিঃ। তবে আর কি কথা আছে, যা আপনি আমার কাছে প্রস্তাব কর্‌তে ইতস্ততঃ করছিলেন?

তর্ক। রামগোপাল মৃত্যুকালে নগদ প্রায় ষাট হাজার টাকা আর সম্পত্তিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর যে শেষ উইল হয়, সেই উইলে তিনি দুর্গাবতীকেই সেই সমস্ত দিয়ে গেছেন। আর তার এই স্বামীকেই সমস্ত বিষয়ের অছি করে গেছেন। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ সব সম্পত্তি কার হাতে আছে?

জ্যোতিঃ। আমি তার কিছুই জানি না, কেবল সেই সময় শুনেছিলাম—এই কন্যা কিছু সম্পত্তি পেয়েছে। সে সমস্তই নবীনগোপাল বাবুর হাতে আছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—"যদি চিকিৎসার দ্বারা দুর্গাবতী আরোগ্য হয়, আর যদি তাহাকে শাস্ত্রানুযায়ী গ্রহণ করা যায়, তবে তার সম্পত্তি ও নগদ টাকা গুলিও সেই সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে।"

খগেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আমি নগদ টাকা কি সম্পত্তি কিছুই চাই না। আমি কেবল আমার স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় চাই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কহিলেন—"আমি যতদূর বুঝেছি—তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আপনাকে দেখতে পেলে তার সে রোগ থাক্‌বে না।"

এই সময় তর্কালঙ্কার মহাশয় খগেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—"আর কোন কথা তোমার বল্‌বার আছে কি?"

খগেন্দ্রনাথ তখন অবনত মস্তকে কহিলেন—"আমি একবার তাকে দেখ্‌তে চাই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কহিলেন—"আমিও সে বিষয়ের জন্যে আপনাকে অনুরোধ কর্‌বো মনে করছিলাম। আপনারা ইচ্ছা কর্‌লে এখনই দেখ্‌তে পারেন।"

তর্কা। তাকে কোথায় রাখা হয়েছে?

জ্যোতিঃ। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা, ডাক্তারের মত নয়, সেই কারণ আমার বাড়ীর পশ্চাতের বাগানে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে বাগান পাঁচিলে ঘেরা, সুতরাং সেখান থেকে পালাবার কোন উপায় নাই। এখন সেই বাগানে গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।

খগেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন! সঙ্গে সঙ্গে তর্কালঙ্কার মহাশয়ও উঠিলেন। এমন সময় সেই গৃহে নবীনগোপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই জ্যোতিঃপ্রকাশের মুখে তিনি সমস্ত শুনিলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশ যে নিজেই দুর্গাবতীকে পরিত্যাগ করিতে রাজী হইয়াছেন,—সে কথা শুনিয়া মনে মনে সন্তুষ্টও হইলেন। কিন্তু কন্যা পাছে তাঁহার হাত ছাড়া হইয়া যায়, সেই জন্যে কিছু চিন্তিত হইলেন। এই সময় দুর্গাবতীকে দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাব হইল। তিনি সে প্রস্তাবে প্রথমে বাধা দিলেন; কিন্তু যখন জ্যোতিঃপ্রকাশ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ মত দিলেন, এবং এ সাক্ষাতের ফল শুভ হইতে পারে—এরূপভাবে তাঁহাকে বুঝাইলেন, তখন তিনি আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না।

তখন চারিজনে ধীরে ধীরে সেই উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন—পাগলিনী আজ যেন বনদেবী সাজিয়া উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে উদ্যানে যে কিছু ফুল ছিল, আজ পাগলিনী সমস্ত তুলিয়াছে এবং সে সমস্ত ফুলে মালা গাঁথিয়া নিজে পরিয়াছে। দুর্গাবতী আজ ফুলসাজে ভূষিতা। গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মুকুট, হস্তে ফুলের অলঙ্কার। পাগলিনী আপন মনে গাহিতেছে—নাচিতেছে—আবার কখনও ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছে।

খগেন্দ্রনাথ নির্নিমেষনয়নে পাগলিনীকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। পাগলিনীর সে দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না, সে আপন মনে আজ যেন মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাগলিনীর আজ এত আনন্দ কিসের?—এ কথা তখন উপস্থিত চারিজনেরই মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তখন সে কথার কোন মীমাংসাই করিতে পারিলেন না।

ক্রমে তাঁহারা ধীরে ধীরে পাগলিনীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পাগলিনীর তখনও সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহারা ক্রমে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সে তাহাতেও তাঁহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। এই সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ কহিলেন—"কে এসেছেন—একবার চেয়ে দেখ।"

উন্মাদিনী এইবার চাহিল। বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে স্থির দৃষ্টিতে খগেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিল, আর প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল স্থিরভাবে সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইবার সে ভঙ্গি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল! সে ধীর ও স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া কাহার চক্ষে পলক পড়িতেছিল না—কাহার মুখে একটিও কথা নাই! কিছুক্ষণ পরে উন্মাদিনী উন্মত্তভাবে দৌড়িয়া আসিয়া খগেন্দ্রনাথকে সজোরে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। খগেন্দ্রনাথও উন্মত্তভাবে উন্মাদিনীকে আপনার বক্ষে স্থান দিলেন। কিছুক্ষণ স্বামী খগেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে স্ত্রী দুর্গাবতী স্থির ও নিশ্চলভাবে রহিল। কিন্তু এ

কি! পাগলিনীর দেহ ক্রমে এরূপ অসাড় ও শক্ত হইল কেন?

সকলে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল—স্বামীবক্ষে পাগলিনীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে! খগেন্দ্রনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে পড়িয়া গেলেন। নবীনগোপাল একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আর তর্কালঙ্কার মহাশয় বজ্রাহতের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন! জ্যোতিঃপ্রকাশ চীৎকার করিয়া উঠিল—"সতী ফুল-সাজে ভূষিতা হয়ে, পতিবক্ষে স্বর্গারোহণ করেছেন!"

সমাজ-চিত্র।

কনক-লতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড় আশায় শৈলেন্দ্র নিরাশ হইলেন। ২৬শে শ্রাবণ বিবাহের দিন অবধারিত ছিল—আয়োজনেরও কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু পিতা রোগশয্যায় শায়িত, সুতরাং এ অবস্থায় কিরূপে পুত্রের বিবাহ হয়? সেই কারণ, শৈলেন্দ্রের বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রহিল। শৈলেন্দ্রের পিতার নাম গুরুদাস ঘোষ। হুগলী জেলার অমরাবতী গ্রামে তাঁহার নিবাস। তিনি এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র জমীদার। নিজগ্রাম অমরাবতী তাঁহার পত্তনী তালুক। ইহা ব্যতীত আরো দুইখানি পত্তনী গ্রাম এবং লাখরাজ জমীজমাও তাঁহার যথেষ্ট আছে। এই সকল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ। গ্রামে সুবোধ-চন্দ্র বসুর কন্যা কনক-লতার সহিত শৈলেন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই স্থির আছে, কিন্তু হয় পাত্র পক্ষ, না হয় কন্যা পক্ষ—এই উভয় পক্ষেরই একটা না একটা দৈব ঘটনায় এতদিন সে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

সে দৈব ঘটনা অন্য কিছু নহে—একমাত্র ম্যালেরিয়া জ্বর। অমরাবতী পূর্ব্বে অমরাবতীই ছিল, কিন্তু এখন একবারে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে যে কত লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে মরিয়া গিয়াছে—কত লোক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে—তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। বড় বড় বাড়ী—কিন্তু লোক-জন নাই! হয় একবারেই চাবিবন্ধ করিয়া বাড়ীর লোক প্রাণভয়ে পালায়ন করিয়াছে, না হয়—যুদ্ধ অবসানে রণভূমির আহত সৈন্যের ন্যায় দুই একজন মাত্র এখনও সে বাড়ীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, অবশিষ্ট সকলেই মরিয়া গিয়াছে! গ্রামের সে আনন্দ ও উৎসব আর নাই। আজ দুই বৎসর হইতে চলিল—সেই মহা সমারোহের বারোয়ারী পূজা এখন একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যস্থলে বারোয়ারীর সেই প্রকাণ্ড আটচালা ভগ্ন অবস্থায় এখনও দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যেমন বারোয়ারীতলা—শিবতলার অবস্থাও তদ্রূপ। চৈত্রমাসের গাজনের সময় যে শিবতলার শোভা দেখিতে কত ভিন্নগ্রাম হইতেও লোক আসিত, আজ তাহা একবারে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বৈকালে পূর্ব্বের ন্যায় এখানে সে তাস, পাশা ও দাবা-খেলার ধুম আর নাই। সে উচ্চ হাসি, সে জয়পরাজয়ের আনন্দ-কোলাহলে

এ প্রাঙ্গণ এখন আর প্রতিধ্বনিত হয় না। তৎপরিবর্ত্তে সন্ধ্যা হইতে না হইতে শৃগাল কুকুরের বিকট চীৎকারে দেবাদিদেব মহাদেবের নিত্য আরতিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে! গ্রামে যে বাজার বসিত, তাহা এখন বন্ধ হইয়াছে। যে গ্রামে লোকজন নাই, ক্রয় বিক্রয় হয় না, সে গ্রামে আর বাজার থাকিতে পারে না। বাজারে যে ময়রার দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারী এবং বেণে-মসলার দোকান প্রভৃতি ছিল, সে সকলও এখন আর নাই, কেবল সেই সকল দোকান গৃহের ভগ্নাবশিষ্ট আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে আছে—কেবল একমাত্র রামধন মুদীর দোকান। সে দোকানও মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন বন্ধ থাকে, সুতরাং সে সময় এক পয়সার বাতাসার আবশ্যক হইলেও গ্রামবাসীকে গ্রামান্তরে ছুটিতে হয়।

গ্রামের জমীদার ঘোষ মহাশয় হইতে কুটীরবাসী রামদাস তুলে পর্য্যন্ত সকলেরই অবস্থা যেন ক্রমেই হীন হইতেছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রজারা চাষ আবাদ করিতে পারে না, কাজেই খাজনা বাকী পড়িয়া যায়, সুতরাং জমীদারের আর উন্নতি কি রূপে হইবে? গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। রোগশয্যায় পড়িয়া তাহাদের চাষ বন্ধ, সুতরাং গৃহে অন্ন নাই, তার উপর রোগের ব্যয় আছে, সুতরাং তাহাদের অবস্থা ক্রমেই হীন হইবারই কথা। যে সকল ভদ্রলোক বিদেশে চাকুরী করিতেন, তাঁহারা প্রাণের ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর স্থলে এখন সপরিবারে বাস করিতেছেন, সুতরাং এখন সাংসারিক ব্যয় অধিক হওয়ায়, তাঁহাদের আর উন্নতির আশা নাই। তবে গ্রামের মধ্যে এক ব্যক্তির অবস্থার ক্রমেই উন্নতি দেখা যায়—সে ব্যক্তির নাম নন্দলাল পয়োমারিক। নন্দলাল পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের জনৈক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিলেন। এখন দেশে আসিয়া নিজেই ডাক্তার হইয়াছেন। এই ডাক্তারী ব্যবসায় এখন নন্দলালের বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জনও হয়, সুতরাং অবস্থার উন্নতি না হইবে কেন? গ্রামের অপর চিকিৎসক কবিরাজ ব্রজনাথ গুপ্ত—নিতান্ত হীন অবস্থার লোক। কারণ, নিতান্ত দরিদ্রলোক ভিন্ন কবিরাজ মহাশয়কে এখন আর কেহ চিকিৎসার জন্যে ডাকে না, সুতরাং কবিরাজ মহাশয়ের দিন চলাই ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কনকলতার পিতা সুবোধচন্দ্র কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করেন। তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পাত্রের পিতা গুরুদাস ঘোষের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায়, এ যাত্রা আর তাঁহার কন্যার বিবাহ হইল না। সুতরাং তিনিও বড় আশায় নৈরাশ হইলেন। কলিকাতা প্রত্যাগমনের পূর্ব্ব দিবস তিনি একবার ভাবী বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন ঘোষজ মহাশয় অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থ ছিলেন। অন্যান্য দুই চারি কথার পর, সুবোধচন্দ্র কহিলেন—"গুরুদাস দাদা, আপনি এদেশের মায়া আপাততঃ পরিত্যাগ করুন, এ ম্যালেরিয়া দেশে থাকলে আপনার রোগ শীঘ্র আরাম হবে না।"

ঘোষজ মহাশয় তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"কোথায় যাবো ভাই?"

সুবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন—"কলিকাতায় চলুন। এখন কলিকাতার স্বাস্থ্য

খুব ভাল। চিকিৎসা ও অন্য সবের যতন হবে, দুই তিন মাস থাকলেই আপনি আরাম হয়ে যাবেন। আমি কেবল মেয়েটির বিয়ের জন্যেই এতদিন পরিবারদের এখানে রেখেছি; আপনি যদি যান, আমিও সেই সঙ্গে পরিবারদের নিয়ে যাই। না হয়—সেইখানেই আমাদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হবে। আর দেশের মায়া করবেন না। সামনে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস্ আসছে। এ সময় দেশের মায়া করতে গিয়ে শেষে কি প্রাণটা হারাবেন ?”

ঘোষজ মহাশয় কহিলেন—“দেখ ভাই, কথাটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়। তোমাদের কি ? তোমরা চাকুরে লোক—চাকুরীর স্থলে সপরিবারে থাকাই তোমাদের সুবিধাজনক। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। সাম্‌নে দুর্গোৎসব— জন্মাষ্টমীর দিন কাটামোয় ঘা পড়বে। এ সময় আমি সপরিবারে কল্‌কাতায় গেলে কে সব উদ্যোগ আয়োজন করবে বল ? গ্রামে তখন পূজারি কত ধূম ছিল। এখন একে একে সকল বাড়ীর পূজাই বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল হয়—আমার বাড়ী—তাও সাবেক ধূমাধাম আর নাই। ধুমধামের পয়সাও নাই—লোক-বলও নাই। তবে বৎসরান্তে মায়ের পাদপদ্মে গঙ্গাজল আর বিল্বপত্র দেওয়া হয়, আর গ্রামের লোকে—যে কয়জন এখনও বেঁচে আছে—বৎসরান্তে মার পাদপদ্ম একবার দেখতে পায়। আমি কি পৈত্রিক দুর্গোৎসবটি তুলে দিতে পারি ভাই ?”

সুবোধ। আমি পৈত্রিক পূজা তুলে দিতে বলি না দাদা। পূজোর ভার আপনার কর্ম্মচারী উমেশ গোমস্তার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এখন আর সাবেকের মতন পূজায় বাহুল্য ব্যয় করবার নাই, তখন কোন রকমে পূজাটি তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে।”

গুরুদাস। তা কি করে হবে ভাই ? কেবলত পূজা নয়—আবার মাথার উপর অষ্টম ঝুলছে—পূজার সময় উমেশকে ত আদায় তহশিল নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। মহালের অবস্থাত তুমি সবই জান। টাকা চাই—অষ্টম রক্ষা করতে। আবার টাকা চাই—পাদপদ্মে গঙ্গাজল বিল্বপত্র দিতে। অভাবপক্ষে ৫০০০৲ হাজার টাকার আমার আবশ্যক।

সুবোধ। এত কেবল গঙ্গাজল আর বিল্বপত্র দেওয়া নয়, এ যেন দাদা, দেহের রক্ত দিয়ে মার পূজা করা হচ্ছে। যাক—সে বিষয়ে আমি আর আপনাকে কি বল্‌বো—আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন তাই করুন্। তবে আমার কন্যাটির বিয়ের জন্যেই আমি বড় ভাবিত হয়েছি। তার বয়ঃক্রম যে প্রায় বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ছেলের বিয়ে দিতে আপনার কোন বাধা হবে না ত ?

গুরুদাস। তাতে কোন বাধা হবে না। কারণ, শৈলেন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নয়—শৈলেন্দ্রের পূর্ব্বে আমার এক পুত্র জন্মেছিল—তাত তুমি জান। তুমি কল্‌কেতা—কল্‌কেতা কর, সেই বিয়ের পরেই না হয়—একবারে গঙ্গাপারে যাবো।

এই সময় হঠাৎ সুবোধচন্দ্রের মনে উদয় হইল—“আর তার পূর্ব্বেই যদি আপনাকে মৃত্যু নদীর অপর পারে যেতে হয় ?” কথাটা মনে হইল বটে, কিন্তু মুখে আর সে কথাটা বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ এমন ভয়ঙ্কর একটা কথা মনে উদয় হওয়ায়, তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তখন আর সে স্থানে অপেক্ষা

না করিয়া তাঁহারা বৈদ্যরাজের নিকট তৎক্ষণাৎ বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বিষণ্ণমনে গৃহের দিকে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ বৎসর তরা কার্ত্তিক শারদীয়া পূজা। আশ্বিন মাসের মধ্যেই গুরুদাস ঘোষের পীড়া বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল। ম্যালেরিয়া জ্বর অষ্ট প্রহর ভোগ হইতেছে। প্লীহা ও যকৃতের যতদূর বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, সে পক্ষেও কোন ত্রুটি নাই। শরীরের অবস্থাও ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর কেবল কর্ত্তা নহেন, এখন পরিবারের মধ্যে সকলকেই ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে! শৈলেন্দ্রের জননী এতদিন প্রাণপণে কর্ত্তার সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন তিনিও রোগশয্যায় শায়িতা, তাঁহারও প্রতিদিন কম্প দিয়া জ্বর হইতেছে। শৈলেন্দ্রের দেহেও ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারও একদিন অন্তর ভয়ঙ্কর জ্বর হয়। বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন—এমন কি দাসদাসীগণের পর্য্যন্ত—এই দশা। সুতরাং মুখে জল দেয়—এমন লোক নাই।

প্রতি বৎসর বর্ষার পরেই গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীরই এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায়। তবে এ বৎসর ম্যালেরিয়ার যেন কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। জমীদারের বাড়ীরই যখন এই অবস্থা, তখন গ্রামের অন্যান্য বাড়ীর অবস্থা যে কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যখন জ্বর হয়, তখন সকলকেই আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিয়া শয্যায় শয়ন করিতে হয়। তার পর জ্বর ছাড়িয়া গেলে, শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া অনেকেই সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং ইচ্ছামত আহার করিতেও ত্রুটি করে না। বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকেই বৎসরের মধ্যে ছয়মাস কাল এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপ ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে যখন প্লীহা ও যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং শরীর একবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন রোগশোকের সকল জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া তাহারা ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়!

এখন জমীদার মহাশয়েরও বুঝি বা সেই অবস্থা দাঁড়ায়। শৈলেন্দ্র কি করিবেন—কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সম্মুখে দুর্গোৎসব—প্রতিমা গঠন প্রায় শেষ হইয়া গেল—পূজার উদ্যোগাদি প্রায় বাকি নাই—এ অবস্থায় পূজা বন্ধ করা হয় না। জননীও রোগ শয্যায় পড়িয়া আছেন, এ সম্বন্ধে কাহার সহিত পরামর্শ করিবেন—সেই কথা ভাবিতেছেন। এমন সময় নন্দ ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্থ হইলেই লোকের সমাজিক সম্মান বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তখন আবার বিদ্যা না থাকিলেও সে ব্যক্তি বিদ্বান ও বুদ্ধি না থাকিলেও সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান হয়। নন্দ ডাক্তারের পিতা সদয় পরামাণিক গ্রামে জাতি-ব্যবসা অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য করিত, তখন গ্রামস্থ সমাজে তাহার কোন সম্মানই ছিল না। তাহাকে পাঁচজনের মধ্যে এক জন বলিয়া তখন কেহই গণ্য করিত না! কিন্তু তাহারই পুত্র নন্দলাল এখন ডাক্তারী ব্যবসায় বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, সুতরাং সেই দরিদ্র সদয় পরামাণিকের যে সমাজে যে সম্মান ছিল না, এখন তাহার এই ধনীপুত্র নন্দ ডাক্তারের তাহা অপেক্ষা দশগুণ সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে! সমাজে টাকার এমনি প্রতাপ!

শৈলেন্দ্র ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া বিশেষ

সমাদর করিলেন এবং তিনি যে আসনে বসিয়াছিলেন, সেই আসনেই তাঁহাকেও বসিতে কহিলেন। ডাক্তার বাবু উপবেশন করিয়াই কহিলেন—"আজ কর্ত্তা মশাই কেমন আছেন বলুন দেখি—শৈলেন্দ্র বাবু?"

শৈলেন্দ্র তখন কহিলেন—"দেখুন ডাক্তার বাবু, কর্ত্তার অবস্থা ত আমার ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। এখানে থাক্‌লে বোধ হয় তাঁকে আর বাঁচাতে পার্‌বো না। তাঁকে নিয়ে এখান থেকে পালাবো কি না, সেই বিষয়ে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ কর্‌তে ইচ্ছা করি।"

ডাক্তার বাবু যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"কেন—কোন নূতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে না কি?"

শৈলেন্দ্র উত্তর করিলেন—"নূতন উপসর্গ কিছুই নাই বটে, কিন্তু সেই জ্বর আছে, সেই প্লীহা যকৃতের যন্ত্রণাও আছে। আর রোগী যেন ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছেন!"

"তবে আগে রোগী দেখে আসি—তার পর পরামর্শ হবে।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া শৈলেন্দ্র বাড়ীর মধ্যে রোগী দেখাইতে গেলেন। পরামাণিকের-পো ডাক্তার বাবুর এখন কমলার কৃপায় ডাক্তারী সাজসজ্জা সকলই হইয়াছে। মোটা চেন ও ঘড়ি, ষ্টেটিস্‌কোপ, থার্ম্মমিটার, পকেটকেস প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি ছিল না। কর্ত্তা আজ আর ভালরূপ কথা কহিতে পারিলেন না—কেমন আচ্ছন্ন অবস্থায় নির্জ্জীবভাবে পড়িয়া আছেন। ডাক্তার বাবু আসিয়া প্রথমেইত বগলে থার্ম্মোমিটার দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া পাঁচমিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তার পর যখন হইতে থার্ম্মোমিটার বাহির করিলেন এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"দেখুন দেখি, আজ জ্বর একেবারে তিনডিগ্রি কম দেখছি। অন্য দিন এ সময় জ্বর এক-শো চার ডিগ্রি থাকে, আজ একশো একের বেশী নয়। রোগত অর্দ্ধেক আরাম হয়ে গেছে বল্‌তে হবে।"

এই সময় রোগী একবার কাসিলেন। সেই কাসির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর গলাটাও ঘড় ঘড় করিয়া উঠিল। তখন শৈলেন্দ্র কহিলেন—"সর্দ্দীটা বসেছে—দেখ্‌ছেন ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার বাবু পকেট হইতে ষ্টেটিস্‌কোপ বাহির করিয়া রোগীর দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার পিট দেখিলেন, তার পর একবার বুক দেখিলেন। মাথামুণ্ডু কি বুঝিলেন,—জানি না, কিন্তু মুখে কহিলেন—"এমন কি সর্দ্দী বসেছে? বুড়ো লোক আবার কবে সর্দ্দী ছাড়া হয়?"

তখন শৈলেন্দ্রের দুর্ভাবনা কতক অংশে দূর হইল। তিনি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঔষধ আর পথ্য এখন কি ভাবে চল্‌বে?"

"উপশম যখন পাওয়া গেছে, তখন আর change করবার দরকার নাই। সাবেক ব্যবস্থামতই চলুক।"—এই কথা বলিয়াই ডাক্তার বাবু রোগী দেখা শেষ করিলেন। তখন শৈলেন্দ্র কহিলেন—"একবার মাকে দেখ্‌তে হবে?"

ডাক্তার বাবুর তখন যেন কি একটা কথা হঠাৎ স্মরণ হইল—এইভাবে কহিলেন—"হাঁ, তোমার মা কেমন আছেন বল দেখি।"

শৈলেন্দ্র। সেই রকমই—কিছুই ত

উপশম দেখ্‌তে পাই না। সেই রকমই কফ—সেই রকমই পিপাসা, আর সেই রকমই বমি, আর সেই রকমই গায়ের জ্বালা।

ডাক্তার। আরে বল কি—তা হলে ত ঔষধে বিলক্ষণ উপকার হয়েছে দেখছি। এক রকম থাকাইত ভাল। দিন দিন রকম রকম হলে কি আর তার চিকিৎসা চলে? তবে তোমার মাকে আর দেখ্‌তে হবে না—তিনিও সেই ঔষধই খান্। দেখুন শৈলেন বাবু, ভাল ভাল ডাক্তারে ঔষধ কখন বদলায় না। আপনাদের দেশের মতন পাড়াগেঁয়ে ডাক্তারেরাই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ বদ্‌লায়। আমিও অনেক রকম ঔষধ জানি—আমারও অনেক ঔষধের নাম জানা আছে—তবে ৩।৪ রকম বই আর Prescription এ ব্যবহার করি না। সে কেবল ঔষধের উপর বিশ্বাস আছে বলেই। পাড়াগাঁয়ে থাকি বটে, কিন্তু আমি সব সময়ই কল্‌কেতায় বড় বড় ডাক্তারের চালে চলি।

শৈলেন্দ্র। যা হ'ক, আপনি দেশে এসেছিলেন—তাই আমাদের রক্ষা। তবু চিকিৎসাটা ত চল্‌ছে।

ডাক্তার। থাক ও সকল কথা। কি জানেন—শৈলেন্দ্রবাবু, আমি নিজের সুখ্যাতি শুন্‌তে বড় ভাল বাসি না। এখন তুমি কেমন আছ বল দেখি?

শৈলেন্দ্র। আমারও ত একদিন অন্তর জ্বর হচ্ছে।

ডাক্তার। তুমি ঐ যে মাঝে মাঝে ঔষধ খাওয়াটা বন্ধ রাখ, এতেই তোমার জ্বরটুকু সার্‌ছে না।

শৈলেন্দ্র। ঔষধটা কি চিরকালই খাবো ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। চিরকাল যদি রোগ থাকে তবে অবশ্যই খাবে।

শৈলেন্দ্র। চিরকালই যদি রোগ থাকে, তবে আর চিকিৎসাটা কি?

ডাক্তার। কেন—বাঁচিয়ে রাখা।

শৈলেন্দ্র। তাত আর চিরদিন বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবেন না।

ডাক্তার। যা অসম্ভব, তা আর কি করে পারবো? যতদূর সম্ভব তাত পারলুম। ডাক্তার হলেও আমিত মানুষ।

এই কথার পর হাসিয়া ডাক্তার বাবু ভিজিটের টাকা পকেটে রাখিলেন। টাকা রাখিবার সময় একবার পকেটটা বাজাইয়া দিলেন। তার পর এক লম্ফে ঘোড়ায় উঠিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবু কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শৈলেন্দ্র একমনে অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় উমেশ গোমস্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। উমেশ আসিয়াই কহিল—"বাবু, আমিত কর্ত্তা-বাবুর আজকের অবস্থা ভাল দেখ্‌ছি না। নন্দ ডাক্তারের কথা আপনি শুনিবেন না—একবার ব্রজ কবিরাজকে এনে দেখান। লোকটার ধাতজ্ঞান বেশ আছে—আর বহুদর্শীও বটে।"

উমেশচন্দ্রের কথায় শৈলেন্দ্রের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তাহাকেই কবিরাজ ডাকিয়া আনিবার ভার দিলেন। কবিরাজ ব্রজনাথ গুপ্ত মহাশয় আসিয়াই একবার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—আর কিছুই পরীক্ষা করিলেন না। একবার মাত্র নাড়ী টিপিয়াই রোগীর সমস্ত অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার মুখখানি বিবর্ণ হইল। কবিরাজ মহাশয়ের মুখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া শৈলেন্দ্র তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দেখ্‌লেন কবিরাজ মহাশয়?"

কবিরাজ মহাশয় সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন—"বাহিরে চলুন—বল্‌ছি।"

বাহিরে আসিয়াই তিনি শৈলেন্দ্রকে কহিলেন—"রোগীর সম্মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে নাই বাবা। যা'ক সে কথা—আমি কর্ত্তার এখন যে অবস্থা দেখ্‌ছি—তাতে আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।"

শৈলেন্দ্র। ব্যারামটা কি খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে কবিরাজ মহাশয়?

কবিরাজ। হাঁ—খুবই কঠিন।

শৈলেন্দ্র। তবে কি কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবো?

কবিরাজ। চিকিৎসা আর কি করাবে বাবা? তবে গঙ্গাযাত্রাটা করাতে পার। সে সময় ঠিক্ উপস্থিত হয়েছে।

শৈলেন্দ্রের মস্তকে যেন বিনা মেঘে এক ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত হইল। বজ্রাহতের ন্যায় তিনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই সময় চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থলও ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"তবে কি বাবার জীবনের আশা নাই? আজ তিন ডিগ্রি জ্বর কম দেখে—এই মাত্র যে নন্দ ডাক্তার বলে গেলেন—অর্দ্ধেক রোগ আরাম হয়ে গেছে।"

ঈষৎ হাসিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন—"বাবা, এ সময় জ্বর কমই হবে। এখন যেটুকু আছে—আর ঘণ্টা দেড়েক পরে, সেটুকুও থাক্‌বে না। তার পর ক্রমে হিমাঙ্গ হতে আরম্ভ হবে, আর সর্দ্দীটাও খুব জোর করবে। আজকের ভোরের সময় কি হয় বলা যায় না।"

এই কথা বলিয়া কবিরাজ গৃহে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে আর কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হইল না। একে কবিরাজ তায় তিনি আবার যেরূপ অশুভ সংবাদ দিলেন, তাতে তিনিও কোন পারিশ্রমিক আশা করিতে পারেন না। তবে গরীব কবিরাজ বেচারীর কথাই ঠিক হইল। সেই দিন অতি প্রত্যুষেই ঘোষজ মহাশয় পবিত্র গঙ্গানদীর পরিবর্ত্তে অপবিত্র মৃত্যু-নদীর পর পারে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গেলেন—আর ফিরিয়া আসিলেন না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে দুর্গোৎসব—এ সময় পিতৃ-বিয়োগ। আবার স্বামীশোকে জননীর জীবনও রক্ষা হওয়া ভার! সুতরাং শৈলেন্দ্র যে কি অবস্থায় পতিত হইয়াছেন—সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অষ্টমের টাকা দিয়া বিষয় রক্ষার কথা—এস্থলে আর উল্লেখ করিবার আবশ্যক দেখি না। এরূপ স্থলে আত্মীয় বন্ধু সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। তবে গ্রামে আত্মীয়বন্ধু অনেক থাকিলেও প্রায় সকলেরই অবস্থা সমান। তথাপি সুবোধ-চন্দ্রের স্ত্রী—অন্নপূর্ণা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারও মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর হইত বটে, কিন্তু সে সময় তাঁহার শরীর মন্দ ছিল না। তিনি ভাবী জামাতার এরূপ বিপদের সময় আর স্থির থাকিবেন কিরূপে? কাজে কাজেই তিনি শৈলেন্দ্রের গৃহে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কন্যা দুটিও আসিল। সংসারে সেরূপ কেহ ছিল না—সুতরাং এরূপ বালিকা কন্যাদ্বয়কে কাহার নিকট রাখিয়া আসিবেন?

কোন রকমে অতি কষ্টে শ্রাদ্ধাদি হইল—পূজাও বাকি থাকিল না। কিন্তু এ

দিকে স্বামীশোকে গৃহিণীর রোগের আর কিছুই প্রতিকার হইল না। শৈলেন্দ্র জননীকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু জননী কিছুতেই কাহার চিকিৎসাধীন হইতে সম্মত হইলেন না। পতিশোকে সতী যে কোন রকমেই হউক—নিজের জীবন বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইংরাজের আইনে সহমরণ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সতীর পতি অনুগমনের সকল পথ বন্ধ হয় নাই।

শেষে পতিশোককাতরা গৃহিণী পতিরই অনুগমন করিলেন। পৃথিবীর সকল বন্ধন শৈলেন্দ্রের এখন ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু মহামায়ার কৌশল। এই সময় একটা নূতন বন্ধন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়কে বাঁধিতে আরম্ভ করিল। সে বন্ধন—কনক-লতা! কনক লতা প্রথম প্রথম শৈলেন্দ্রের ত্রিসীমানায় আসিত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সে বালিকাসুলভ লজ্জা দূর হইতে লাগিল। বিশেষতঃ শৈলেন্দ্র যখন রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িত, তখন কনক-লতা শৈলেন্দ্রের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিত না। যখন শৈলেন্দ্র পিপাসায় অস্থির হইয়া জল চাহিত, তখন বালিকার সে লজ্জা কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত! আবার ক্রমে শৈলেন্দ্রকে ঔষধ সেবন ও পথ্যাদি দিবার সময় বালিকাকে আর ডাকিতেও হইত না, বালিকা যথাসময়ে নিজেই আসিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এ অবস্থায় শৈলেন্দ্র যদি একটা নূতন ফাঁসি গলায় লইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে তাহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না—আর এ অবস্থায় দ্বাদশ বৎসরের এক সুন্দরী বালিকার সহিত যদি বিংশতি বৎসরের এক সুন্দর যুবকের বিবাহের পূর্ব্বেই প্রণয়ের সূত্রপাত হয়, তবে তাহাতেই বা আমাদের হাত আর কি থাকিতে পারে?

পূজার সময় কনক-লতার পিতা কলিকাতা হইতে গৃহে আসিলেন। তিনি আসিয়াই শৈলেন্দ্রের অবস্থার কথা সমস্তই শুনিলেন। কেবল পারিবারিক অবস্থা নহে—আর্থিক অবস্থার কথাও সমস্ত জানিতে পারিলেন। মানুষ মরিয়া গেলে পরই—তাহার আর্থিক অবস্থার সঠিক সংবাদ জানিতে পারা যায়। বিজয়ার পর দিনই অন্নপূর্ণা কন্যাকে লইয়া আপনার গৃহে আসিলেন। সে অবস্থায় আত্মীয়কে ফেলিয়া আসা যায় না, কিন্তু তিনি যে কন্যা লইয়া শৈলেন্দ্রের গৃহে থাকেন, তাহা যখন তাঁহার স্বামীর অভিপ্রেত নহে—জানিতে পারিলেন, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। তথাপি আসিয়াই স্বামীকে কহিলেন—"আর দু দিন থেকে আস্‌লে ভাল হতো।"

তৎক্ষণাৎ সুবোধচন্দ্র যেন বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"নিজের সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে?"

অন্নপূর্ণা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আহা! আপনার লোক, আজ বাদে কাল আমার জামাই হবে—এ অবস্থায় ফেলে আসি কি করে?"

তখন সুবোধচন্দ্র কহিলেন—"শৈলেন্দ্রকে আর জামাই করবার সাধ করো না। গুরুদাস দাদার কিছু আছে বলে মনে করেছিলুম—এখন কিন্তু শুন্‌ছি—থাকার মধ্যে কেবল দেনা! সুতরাং বিষয়সম্পত্তি কিছুই থাক্‌বে না। তবে আর সে ছেলের সঙ্গে এত টাকা খরচ করে, আমি মেয়ের বিয়ে দেবো কেমন করে? আর এক

বর্য়া—শৈলেন্দ্রের এক বৎসর এখন কালা-শৌচ রয়েছে—এখন এক বৎসর বিবাহ করতে পারবে না। আমি সে এক বৎসর মেয়ে রাখি কেমন করে? সে সব হচ্ছে না। আমি কালই তোমাদের কলিকাতায় নিয়ে যাবো। সেখানে গিয়ে অন্য পাত্রে কনক-লতার বিয়ে দেবো। টাকা খরচ করলে কলকাতাতেই ভাল পাত্রের অভাব কি?"

স্বামীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা একবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে আর একটীও কথা নাই! অদূরে দাঁড়াইয়া কনক-লতাও পিতার মুখে নিজেও সে সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিল। সে কথা শুনিয়া কনক-লতা ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একটা ভয়ঙ্কর কম্প দিয়া তাহার জ্বর আসিল। সে জ্বরে এক-রাত্রের মধ্যেই কনক-লতা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে অজ্ঞান অবস্থায় অনেক ভুল বকিল, কিন্তু ভুলের মধ্যে একটিমাত্র সত্য কথা ছিল। সে কথাটি—"শৈলেন্দ্র!"]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কনক-লতা একটু সুস্থ হইলেই তাহার পিতা সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার পূর্ব্বেই গ্রামের লোকের নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পাত্র সম্বন্ধে যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে কথাটা তিনি আর গোপন রাখিলেন না। সুতরাং সে কথা শৈলেন্দ্রের অবিদিত রহিল না। নিজের দুঃসময়ের গুরুত্ব শৈলেন্দ্র মনে মনে বুঝিতে পারিলেন। মহাগুরু নিপাতের বৎসরের কথাটাও উক্ত ঘটনায় তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

সুবোধচন্দ্র কলিকাতাতেই কন্যার এক পাত্র স্থির করিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার ব্যয় দ্বিগুণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার যখন সংসারে পুত্রসন্তান নাই—কেবল দুইটি মাত্র কন্যা, তখন ঋণ করিয়া ব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবের নিকটে প্রায় তিন হাজার টাকা তাঁহাকে কর্জ্জ করিতে হইল। ২১শে অগ্রহায়ণ বিবাহ—১৪ই অগ্রহায়ণের তারিখ দিয়া সুন্দর সোণার জলে ছাপা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে নিমন্ত্রণের কার্ড বাহির হইয়া গেল। তাহার কয়েক খানি অমরাবতীর ডাকঘরেও আসিয়া পৌঁছিল! তাহার মধ্যে যেখানি ডাক্তার নন্দলাল পরামাণিক মহাশয়ের নামে আসিয়াছিল, সে খানি আজ ষ্টেথিস্‌কোপ, থার্ম্মমিটার ও পকেট কেসের সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার বাবুর পকেটে পকেটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু আজ যেখানে রোগী দেখিতে যাইতেছেন, সেই খানেই কহিতেছেন—"দেখুন দেখি মহাশয়, লোকের কি আক্কেল! এত লোকের জীবন যখন আমার হাতে, তখন আমায় নিমন্ত্রণ করা কেন? আমার যখন খাবারই সাবকাশ নাই, তখন কেমন করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই বলুন। একালের লোকের বিবেচনা আছে—না, বুদ্ধি আছে?"

শৈলেন্দ্র এখন আর ডাক্তার বাবুকে ডাকিতেন না। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ডাক্তার বাবু যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই হইতেই তাঁহার উপর শৈলেন্দ্রের কেমন অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছিল। এদিকে ডাক্তার বাবুও বিনা আহ্বানে আসিতে পারেন না, একটা কোন সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। তখন তিনি অন্য সুযোগ না পাইয়া আজ সুবোধ-

চন্দ্রের নিমন্ত্রণ পত্রের কার্ড উপলক্ষ করিয়াই শৈলেন্দ্রের গৃহে বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইলেন, এবং আসিয়াই শৈলেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ শৈলেন্দ্র, সুবোধ বাবুর কন্যার বিবাহে তোমার নিমন্ত্রণ হয়েছে কি?"

ডাক্তার বাবুর প্রশ্ন শুনিয়াই শৈলেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। একেত যাহাকে দেখিলেই তাহার পিতৃমাতৃবিয়োগশোক উথলিয়া উঠে, সেই ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! আবার তাহারই মুখে এই প্রশ্ন! সুতরাং তাঁহার ত মাথা ঘুরিয়া যাইবারই কথা। তথাপি অনেক কষ্টে উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমিও এক নিমন্ত্রণ কার্ড পেয়েছি।"

এরূপ উত্তরের পর ডাক্তার বাবুর কার্ড দেখাইবার কিছুই আবশ্যক ছিল না। তথাপি ডাক্তার বাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না, পকেট হইতে সেই গোলাপি রংয়ের খামযুক্ত কার্ডখানি বাহির করিলেন। খাম হইতে সে গোলাপী রংয়ের কার্ডও বাহির করিয়া শৈলন্দ্রকে দেখাইলেন। ডাক্তারেরা দেহের রোগেরই চিকিৎসা করিয়া থাকেন, মনের রোগের কোন চিকিৎসাই তাঁহারা জানেন না। তবে এ ডাক্তার বাবুর যে মনের রোগ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে, সেই কার্ডখানি দেখানতেই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাকে নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে কলিকাতায় যেতে হবে?"

বজ্রভরা প্রাবৃটের মেঘের ন্যায় মলিন-মুখে একটা বৈদ্যুতিক হাসি হইয়া শৈলেন্দ্র উত্তর করিলেন—"না।"

এইক্ষুদ্র "না" কথাটি বলিয়াই শৈলেন্দ্র নীরব হইলেন। কিন্তু এই সময় ডাক্তার সকলের নিকট যে কথাটা বলিয়া বেড়াইতেন, সেই কথারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া কহিলেন—"তা যদি আইবুড়ো ভাতের তত্ত্বের লোভেই নিমন্ত্রণটা করা হয়ে থাকে, সে পক্ষে আমিও কোন ত্রুটি করবো না।"

ডাক্তার বাবু গৃহে চলিয়া গেলেন। কি ভাবিয়া শৈলেন্দ্রও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পিতার ঘরে যে লৌহ সিন্দুক ছিল, সেই সিন্দুক খুলিলেন। তাঁহার বিবাহের জন্যে পিতা যে সকল নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সমস্ত বাহির করিলেন। তার পর তাঁহার ভাবী পত্নীর গাত্র হরিদ্রার তত্ত্বের জন্যে পিতা যে সুন্দর বেনারসী কাপড় ক্রয় করিয়া রাখিয়া ছিলেন, একটি প্যাটরা হইতে সেখানিও বাহির করিলেন। সেই সকল নূতন অলঙ্কার এবং বেনারসী কাপড়ের উপযুক্ত মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বিশেষ ধূমধামের সহিত সুবোধচন্দ্রের কন্যার আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলেন। সে তত্ত্ব যখন সুবোধচন্দ্রের কলিকাতার বাসা-বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, তখন যে দেখিল, সেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল! গ্রামের জমীদার আইবুড়ো ভাতের কি তত্ত্বই পাঠাইয়াছেন;—এই একটা রব চারিদিকে উত্থিত হইল। কিন্তু সে তত্ত্ব দেখিয়া কাহার আর তাঁহাকে সামান্য জমীদার বলিয়া মনে হইল না। কারণ, বড় বড় রাজা মহারাজেরাও এমন তত্ত্ব কখনই করিতে পারেন না!

ভিতরের কথাত আর কেহ জানিতেন না—কেবল জানিতেন—কন্যার জননী অন্নপূর্ণা। কন্যার মনের কথা জানিতে ত জননীর বড় বাকি থাকে না! অন্নপূর্ণা

যখন সে তত্ত্ব দেখিলেন, তখন এক গোপ-নীর স্থানে গিয়া এরূপ শুভদিনেও খানিকটা চক্ষের জল ফেলিয়া আসিলেন। আর কনক-লতা কি করিল? কনক-লতা সে তত্ত্ব একবার চক্ষেও দেখিল না। গাত্র হরিদ্রার সময় যখন অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে শৈলেন্দ্রের প্রদত্ত কয়েকখানি তাহাকে পরাইতে যাওয়া হইল, তখন পরা দূরে থাকুক, কনক-লতা সে সকল অলঙ্কার দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল!

সে রাত্রে কনক-লতার চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না। গভীর রাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত হইয়াছে, তখন ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কনক-লতা ছাদের উপর উঠিল। তার পর সেই অগ্রহায়ণ মাসের হিমে ও শিশিরে সমস্ত রাত্রি খোলা ছাদে বসিয়া রহিল। কনক-লতার গাত্র-দাহ আছে না কি? গাত্রদাহ ছিল কিনা সে সংবাদ আমরা বলিতে পারি না—তবে মনে মনে তার যে একটা মৎলব ছিল, সে সংবাদ আমরা জানি। সে মৎলব অন্য কিছুই নহে—শরীরের মধ্যে একটা রোগকে ডাকিয়া আনা। কনক-লতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এইরূপ ছাদে বসিয়া থাকিলেই প্রাতে তাহার ভয়ঙ্কর জ্বর হইবে। সেই কারণ, সেই হিমে সমস্ত রাত্রি ছাদের উপর বসিয়া সে কেবল মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"হে ঠাকুর, কাল সকালেই আমার যেন খুব একটা জ্বর হয়। তোমার পায়ে পড়ি—ঠাকুর, আমার যেন খুব কম্প দিয়ে ভারি রকমের জ্বর হয়।"

এইরূপে সে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আপনার মনের বাসনা ঠাকুর দেবতার স্থানে জানাইতে লাগিল। কিন্তু এ কলিকালে ঠাকুর-দেবতা অনেক সময়েই বধির হইয়া থাকেন। বালিকার আকুল প্রাণের কাতর প্রার্থনা তাঁহারা কর্ণে তুলিলেন না। পর দিনই ২১শে অগ্রহায়ণ। সেই দিন শুভ-ক্ষণেই হউক, কিম্বা অশুভক্ষণেই হউক—কনক-লতার শুভবিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিধাতার নির্ব্বন্ধ! কে খণ্ডাইতে পারে বল?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কনক লতার বিবাহের পর, শৈলেন্দ্র নিজের রোগের চিকিৎসা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। জীবনের প্রতি তাঁহার কেমন একটা হতশ্রদ্ধা জন্মিল। প্রভুভক্ত উমেশ গোমস্তা বাবুকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল—তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্যে সে একবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বসিল। কিন্তু বাবু কিছুতেই সম্মত হইলেন না—পিতামাতার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই; নিজের এই অপদার্থ জীবনের জন্যে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কেন?

এইরূপে মাঘমাস পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল ফাল্গুন মাসে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটা হ্রাস হইল। এমন সময় মধুরাবতী গ্রামে এক অশুভ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল—প্লেগরোগে কনক-লতার পিতা সুবোধচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে! কলিকাতায় ম্যালেরিয়া নাই—কিন্তু সে বৎসর ফাল্গুন পড়িতে না পড়িতেই প্লেগরোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব বাড়িল। মাস শেষ হইতে না হইতেই আর এক অশুভ সংবাদ!—সেই প্লেগ রোগেই নবপরিণীতা কনক-লতার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে! উপর্য্যুপরি একই পরিবারের এই দুই ভয়ঙ্কর অশুভ সংবাদ গ্রামের যে শুনিল—সেই একবারে মর্ম্মাহত

ইয়া গেল। সে সংবাদ শৈলেন্দ্রের নিকট যখন পৌঁছিল, শৈলেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উমেশ গোমস্তাকে ডাকিয়া কহিলেন—"গোমস্তা মহাশয়, আর আমি এ দেশে থাক্‌বো না, আমি কলিকাতায় যাবো। আপনি আমার যাবার সব উদ্যোগ ও বন্দোবস্ত করুন।"

বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া উমেশের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে আহ্লাদে বলিয়া ফেলিল—"কল্‌কেতায় মাস খানেক থেকে চিকিৎসা করালেই আপ্‌নি আরাম হয়ে যাবেন। মা কালী, এত দিন পরে আপ্‌নাকে সুমতি দিয়েছেন। আমি কালীঘাটে গিয়ে এর জন্যে মার পূজো দেবো।"

শৈলেন্দ্র সে কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"আমি ত চিকিৎসার জন্যে কলিকাতায় যাচ্ছি না—আমি মর্‌তে যাচ্ছি। ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে, এখন আর এখানে থাক্‌লে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হবে না। এই সময় কলিকাতায় নাকি প্লেগের বড়ই ধুম। ম্যালেরিয়ায় আমার মরণ নাই—কেবল যন্ত্রণা ভোগ আছে। তাই প্লেগে আমার মৃত্যু হয় কিনা—সেই পরীক্ষাটা একবার কর্‌তে কলিকাতায় যেতে ইচ্ছা কর্‌ছি।"

কথাটা শুনিয়া উমেশের আনন্দ ঘুরিয়া গেল। তথাপি সে মনে মনে কহিল,—"আচ্ছা, একবার কল্‌কেতায় নিয়ে গিয়ে বাবুকে ত আরাম করি, তার পর তখন বোঝাপড়া।"

শুভদিনে ও শুভক্ষণে উমেশ শৈলেন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবুরই জনৈক আত্মীয় পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহার জন্যে পটলডাঙ্গায় একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া শৈলেন্দ্র চিকিৎসা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনের দরুণই হউক, অথবা অতিরিক্ত ঔষধ সেবনের পর, ঔষধ এককালীন বন্ধ করার দরুণই হউক, শৈলেন্দ্রের সে ম্যালেরিয়া জ্বর ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া গেল। কিন্তু শৈলেন্দ্র এখন আর আরোগ্যলাভের প্রয়াসী নন। প্লেগে মরিবার জন্যেই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। শৈলেন্দ্রের জীবনে আর প্রয়োজন কি? এ পৃথিবীতে শৈলেন্দ্রের আর কে আছে? পিতা নাই—মাতা নাই—আর এক যে আশা ভরসা ছিল, তাহাও থাকিয়াও নাই। শৈলেন্দ্রের জীবনে আর সুখ কি? শৈলেন্দ্রের শেষ আশা ভরসা—প্লেগ! কিন্তু কই? কলিকাতা আসিলেই ত প্লেগ হয় না, বরং রোগ পালায়। হা—অদৃষ্ট!

শৈলেন্দ্রের শরীর যখন তাহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন শৈলেন্দ্র সেই শরীর লইয়া বড় একটা গোলে পড়িলেন। এ সুস্থ শরীর লইয়া এখন কি করিবেন—তাঁহার এই চিন্তাই এখন প্রবল হইয়া উঠিল। শেষে কি ভাবিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন আর মুহূর্ত্ত কালবিলম্ব না করিয়া তিনি কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রবেশলাভ করিলেন এবং পাঁচবৎসর কাল অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে বিশেষ প্রশংসার সহিত শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালে শৈলেন্দ্র ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে অসাধারণ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার কারণ, উৎপত্তি,

ব্যাপকতা, কীটাণু প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্যে তিনি যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, তাহা দেখিয়া কলেজের অধ্যক্ষগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইতেন এবং তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের ভূয়সী প্রশংসাও করিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর, শৈলেন্দ্র ম্যালেরিয়ার এক ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। হাঁসপাতালে সে ঔষধ পরীক্ষা করা হইল। সে পরীক্ষায় শৈলেন্দ্র জয়ী হইলেন।

এই সময় একদিন শৈলেন্দ্র উমেশ-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উমেশ, সুবোধ বাবুর পরিবারেরা এখন কোথায় তুমি জান?"

উমেশচন্দ্র উত্তর করিল—"আজ্ঞে, তাঁরা ত এখন দেশে চলে গিয়েছেন।"

শৈলেন্দ্র। তাদের সে দেনাপত্রের কি হলো?

উমেশ। আজ্ঞে, সমস্ত বেচেকিনে সে সকল দেনা সুবোধ বাবুর স্ত্রী পরিশোধ করেছেন।

শৈলেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিলেন। তার পর উমেশকে কহিলেন—"উমেশ, তোমার কাছে এখন কত টাকা আছে?"

উমেশ। আমার কাছে এখন দুইশত টাকা আছে। কত টাকা এখন আপনার দরকার বাবু?

শৈলেন্দ্র। এখানে আজ পর্য্যন্ত কত টাকা দেনা হবে?

উমেশ। আজ্ঞে, দেনা আমি বড় রাখি নাই বাবু। বাড়ী ভাড়া শুদ্ধ নিয়ে বড় জোর ৫০৲ টাকা হবে।

শৈলেন্দ্র। তবে দেনাপত্র সমস্ত পরি-শোধ কর, আজই দেশে যাবো।

দেশে আসিয়া শৈলেন্দ্রের প্রথম ও প্রধান কার্য্য হইল—তাঁহার আবিষ্কৃত সেই ম্যালেরিয়া ঔষধের উপকারিতাগুণের পরীক্ষা করা। শৈলেন্দ্র সে পরীক্ষায় আশাতীত ফল পাইলেন। ঔষধের মূল্য গ্রহণ না করিয়া ক্রমাগত তাহা বিতরণ আরম্ভ করিলেন। সে ঔষধ যাহাকে দিলেন, সেই ভীষণ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিল। তখন দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

কনক-লতার কনিষ্ঠা ভগিনী কুঞ্জলতার ভয়ঙ্কর জ্বর। কিছুতেই সে জ্বরের উপ-শম হইতেছে না। শৈলেন্দ্রের বিতরিত ঔষধের আশ্চর্য্য ফলপ্রদ গুণের কথা অন্ন-পূর্ণা দেবী শুনিয়া ছিলেন! একদিন বৈকালে তিনি শৈলেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাই-লেন। শৈলেন্দ্র তখন বিষম সমস্যায় পড়ি-লেন। একবার মনে করিলেন—ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন, তিনি নিজে সে বাড়ীতে যাইবেন না। কিন্তু আবার কি ভাবিয় সে প্রস্তাবটা মনঃপূত হইল না। তখ নিজেই ঔষধ লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন ঔষধ সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু সে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পা যেন একবারেই বহনকার্য্যে অসমর্থ হইয়া পড়িল। তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবেন—কি গৃহে ফিরিয়া যাই-বেন—এই কথা তখন তাঁহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া হইতে লাগিল। এই বাড়ীর মধ্যে যাইতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না, তবে এই বাড়ীর মধ্যে এমন একজন আছে, যাহার সহিত তাঁহার দেখা না হই-লেই ভাল হয়। আবার মনে করিতে লাগিলেন—দেখা হইলেই বা দোষ কি? তৎক্ষণাৎ পুনরায় মনে হইল—এ অবস্থায় দেখা না হওয়াই ভাল। আবার মনে হইল—অনেক দিন দেখা হয় নাই। শৈলেন্দ্র অন্নপূর্ণার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া

এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন—এমন সময় অন্নপূর্ণা শৈলেন্দ্রকে দেখিয়া বিশেষ আদর ও যত্নের সহিত তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া কহিলেন—"দেখ বাবা শৈলেন্দ্র, গ্রামসম্পর্কে তুমি আমার ভাসুর-পো। কিন্তু তোমায় আমি পেটের ছেলে মনে করি। আমার এমন অবস্থা হলেও তোমায় দেখে আমি কিছুতেই লজ্জা কর্‌তে পার্‌বো না। তোমায় যদি পর জ্ঞান কর্‌বো—তবে আমাদের দেখবে কে? তুমিই এখন আমাদের অভিভাবক। তা দেখ বাবা, কুঞ্জলতার আজ পাঁচদিন জ্বর হয়েছে। কল্‌কেতা থেকে এসে পর্য্যন্ত তা'র জ্বর হয় নাই, এখন এটাকে নবজ্বর বলতে হবে। তুমি যে ঔষধ সকলকে দিচ্ছ, সুখ্যাতি গ্রামে আর ধরে না। যে খাচ্ছে, সেই আরাম হয়ে যাচ্ছে, আর সেই মন খুলে তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছে। তা হাঁ বাবা, সে ঔষধ কি নবজ্বরেও খাওয়ান যায়?"

তখন শৈলেন্দ্র উত্তর করিলেন—"তাতে নবজ্বরেও আমি বিশেষ উপকার পেয়েছি। আমি সে ঔষধ এনেছি, আপনি স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারেন।"

তখন অন্নপূর্ণা সম্মুখের একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন—"কুঞ্জ ঐ ঘরের মধ্যে আছে, তুমি একবার তাকে দেখে, তার পর কি রকম করে তা খাওয়াতে হয় বলে যাও।"

সে ঘরের দরজা ভেজান ছিল। দরজার নিকট গিয়া শৈলেন্দ্র সে দরজা ঠেলিলেন—দরজা খুলিয়া গেল। এ কি সর্ব্বনাশ! দরজা খুলিয়া সম্মুখেই শৈলেন্দ্র দেখিলেন—আগন্তুককে দেখিবার জন্যে কনকলতা আগ্রহের সহিত একদৃষ্টে দরজার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আবার এ কি! দুজনার চারি চক্ষু মিলিত হইবামাত্র কনকলতা লজ্জায় জড়সড় হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে এরূপ ভাবে—সঙ্কুচিত দেহে আড় হইয়া পড়িল কেন? নিঃশব্দে কনকলতার এরূপ ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসই বা পড়িতেছে কেন? শৈলেন্দ্র তখন যেন হঠাৎ এক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় তিনিও একবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে গেল। কতক্ষণ গেল, সে কথাও শৈলেন্দ্র বলিতে পারিবেন না। এমন সময় রোগী কুঞ্জলতাই শৈলেন্দ্রকে কহিল—"আপনি বসুন না, এ বিছানা ভাল।"

রোগীর কথায় শৈলেন্দ্রের চৈতন্য হইল। কি জন্যে তিনি এই ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন, তখন সে কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি উপবেশন করিবামাত্র কনক-লতার সেই ব্রীড়াবনত মুখখানি আর একবার তাহার নয়ন-পথে আসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে মুখের কি আকস্মিক পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বদৃষ্ট মুখের সে ভাবও এখন আর নাই। সে মুখ এখন একবারে বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। একটি প্রস্ফুটিত নলিনীকে অগ্ন্যুত্তাপে ধরিলে, অকস্মাৎ নলিনীর যে দশা হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে এই মুখেরও সেইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে মুখের দিকে পুনরায় আর একবার চাহিতে শৈলেন্দ্রের আর সাহস হইল না। শৈলেন্দ্র চিকিৎসা ব্যবসায়ী—জ্বর চিকিৎসা সম্বন্ধে কলেজে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন এ রোগী পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তথাপি জ্বর সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রোগী কনক-লতাকে কহিল

—"দিদি, তুমি শৈলেন্দ্র দাদাকে সব কথা বল না।"

দিদি তখন আর থাকিতে পারিল না। কোন কথা না কহিয়া তাড়াতাড়ি সে গৃহ হইতে উঠিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। যাই-বার সময় টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল সেই শয্যার উপর পড়িল। শৈলেন্দ্র তাহা দেখিলেন। কনক-লতা মুখে এক টিও কথা কহিল না বটে, কিন্তু শয্যাসিক্ত সেই দুই অশ্রুবিন্দু শয্যায় পড়িতে না পড়িতে অদৃশ্য হইলেও, এখন শৈলেন্দ্রকে উচ্চকণ্ঠে যেন কত কথাই কহিতে লাগিল! অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর একবারে মন্থন করিয়া তখন একে একে সকল কথাই শৈলেন্দ্রের মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সে কথা অসীম—সে কথা অনন্ত!

এমন সময় অন্নপূর্ণা আসিয়া কহি-লেন—"কেমন দেখ্‌লে বাবা?"

অগত্যা অনেক চেষ্টার পর শৈলেন্দ্রের মুখ হইতে বহির্গত হইল—"এখনও জ্বর ভোগ হচ্ছে—তবে, ভয়ের কোন কারণ নাই—এই অষুধেই আরাম হয়ে যাবে।"

এই কথা বলিয়াই শৈলেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। তখন অন্নপূর্ণা কিরূপে তাহা খাওয়াইবেন—রোগীকে কি পথ্য দিবেন প্রভৃতি অনেক প্রশ্ন শৈলেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শৈলেন্দ্র আর সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। "সমস্তই লেখা আছে"—এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি সে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় আসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শৈলেন্দ্র ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মানুষের সব যায়—কিন্তু স্মৃতি যায় না কেন? এই নশ্বর পৃথিবীর কিছুই ত চির-স্থায়ী নহে, তবে স্মৃতি অবিনশ্বর নাকি? মানুষের সুখ চলিয়া যায়, কিন্তু সেই সুখের স্মৃতি পড়িয়া থাকে। সেই সুখের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি গেলেইত সমস্ত আপদ চুকিয়া যায়! সেই দিন সমস্ত রাত্রি শৈলেন্দ্র কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। স্মৃতির জ্বালায় অস্থির হইয়া সে রাত্রি তিনি আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। প্রভাতে উঠিয়া তিনি উমেশকে ডাকাইলেন। উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কহি-লেন—"উমেশ তোমার কাছে এখন আর কত অষুধ আছে?"

উমেশচন্দ্র উত্তর করিল—"আমি আবার অষুধ তৈয়ারি করাইয়াছি। সুতরাং এখনও যথেষ্ট আছে। আর একটা কাজও করেছি। দেশশুদ্ধ লোককে কি করে অষুধ বিতরণ করা যায়? যারা অক্ষম, এখন কেবল তাদেরই আমি বিতরণ করি। আর যাদের অবস্থা ভাল, তাদের আমি ব্রজ কবিরাজ মহাশয়ের কাছ থেকে কিনে নিতে বলি। আমিই কবিরাজ মহাশয়ের কাছে সে অষুধ রেখেছি। অষুধের কমিশন কবিরাজ মহাশয়ই পান। তাতে তাঁর বেশ উপার্জ্জনও হচ্ছে।"

শৈলেন্দ্র কহিলেন—"দেখ আর এক মাস মাত্র আমি বাড়ীতে থাক্‌বো। তার পর আমি তীর্থপর্য্যটনে যাবো। তুমি এর মধ্যেই আমার সম্পত্তির সমস্ত কাগজ প্রস্তুত কর। বিষয়-সম্পত্তির একটা বন্দো-বস্ত করে আমায় যেতে হবে।"

সে কথা শুনিয়া উমেশচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তার পর কহিল—"তীর্থ

র্য্যটনে যান, সে বিষয়ে আমি নিষেধ করি না। কারণ, এখন আপনার সমস্ত পৈত্রিক দেনা পরিশোধ হয়ে গিয়েছে। এ বৎসর যদি ম্যালেরিয়া আর না থাকে, তবে এই বৎসরেই সমস্ত বকেয়া আদায় হয়ে যাবে। বাবু আমার একটি কথা শুনুন। আগে সংসারী হউন, তার পর তীর্থ পর্য্যটনে যাবেন। আপনি সংসারী না হলে আপনাকে ছেড়ে দিতে আমার কেমন ইচ্ছে হয় না বাবু।”

শৈলেন্দ্র তখন স্পষ্ট কহিলেন—“দেখ উমেশ, এ জীবনে আর আমি সংসারী হবো না।”

চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে উমেশ কহিল—“সে কি কথা বাবু। আপনি এ বংশের একমাত্র বংশধর। এমন কথা মুখে আন্‌বেন না বাবু। আজ মা যদি বেঁচে—”

বলিতে বলিতে উমেশ কাঁদিয়া আকুল হইল। দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া শৈলেন্দ্র কহিলেন—“আমার সে অদৃষ্ট হলে অসময়ে আমার মা-বাপের মৃত্যু কেন হবে বল? আমায় নিষেধ করো না—নিষেধ কর্‌লেও কোন ফল হবে না।”

উমেশ। কত দিন পরে ফিরে আস্‌বেন বাবু?

শৈলেন্দ্র। তা এখন কেমন করে বল্‌বো উমেশ? আবার কখন ফিরে আস্‌বো কিনা—সে কথাও এখন বল্‌তে পারি না।

“সে কি কথা বাবু!”—বলিতে বলিতে উমেশ আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখন শৈলেন্দ্র উমেশকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—“তুমি কেঁদ না উমেশ, আমি আস্‌বো—যদি দেশে ফিরে আসবার উপযুক্ত কখন হই—তখন আবার আস্‌বো।” উমেশ চক্ষের জল মুছিয়া কহিল—“এ কি কথা বলেন বাবু? আপনার মতন পরোপকারী লোক ত আমাদের এ অঞ্চলে নাই; বিশেষতঃ ডাক্তারী পাশ করে এখন দেশে এসেছেন, এ অঞ্চলে তেমন ডাক্তার নাই। এক-জ্বরের অষুধ বিতরণ করে আপনি দেশের লোকের যে উপকার করেছেন, তাতে আপনার সুখ্যাতি ত দেশময় ধরে না।”

শৈলেন্দ্র। সে সকল সুখ্যাতি তোমা-রই প্রাপ্য। লোকে বৃথা আমার সুখ্যাতি করে, তুমিই ত সে সকলের মূল।

উমেশ। সে কি কথা বলেন বাবু। আপনি সকলেরই মূল। আপনি কত রকমে লোকের উপকার করেন। আপনার সুখ্যাতি না করে কি তারা থাক্‌তে পারে?

শৈলেন্দ্র। সুখ্যাতির উপযুক্ত আজও আমি নই। নিজের চিত্তকে আজও যখন আমি বশ কর্‌তে পারি নাই, তখন আমার মতন অধম আর কে আছে? উমেশ, তোমরা জান না—আমি মহা পাপী। এখনও সুযোগ পেলেই পাপ প্রবৃত্তি আমার মনে জেগে উঠে। চিকিৎসকের চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। আমার মন যখন কলুষিত, তখন আমি সে ব্যবসা কিরূপে করিব? এ প্রলোভনময় সংসারে থাক্‌লে চিত্তবশে আমি কখনই কৃতকার্য্য হতে পার্‌বো না। এর জন্যে সাধনা চাই। সেই সাধনার জন্যেই আমি সংসারত্যাগী হবো। তুমি আমায় বাধা দিও না।

উমেশ। বাবু, একটি কথা বলি—এমন সোণার সংসারটা একবারে মাটি কর্‌বেন না। এমন কত হয়—কত যায়। স্ত্রী মারা গেলেও লোকে আবার বিয়ে করে সংসারী হয়। কত লোকের কত হয়ে গিয়েছে, আবার তারা বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

শৈলেন্দ্র। এমন আর কার হয় নাই
উমেশ, এমন আর কারু হয় নাই।

এই কথা বলিয়া শৈলেন্দ্র মস্তক অব নত করিলেন। টস্ টস্ করিয়া চক্ষের জল ভূমিতে পড়িতে লাগিল। উমেশচন্দ্র আর কোন কথা কহিতে সাহসী হইল না —সেও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অন্যত্রে চলিয়া গেল।

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উমেশ স্থির করিল—কোন রকমে বাবুর বিবাহ দিতে পারিলেই তাঁহাকে পুনরায় সংসারী করা যায়। কিন্তু বাবুর পিতামাতা জীবিত থাকিলে, সে কার্য্য যত সহজ হইত, এখন সে কার্য্য তত সহজ নহে। তথাপি উমেশ একবারে নিরাশ হইল না। অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কুঞ্জলতার সঙ্গে গোপনে গোপনে বাবুর বিবাহ স্থির করিল। কুঞ্জলতার নবজ্বর এখন সম্পূর্ণ আরাম হইয়া গিয়াছে, তথাপি কুঞ্জলতার পীড়ার ভাণ করিয়া পুনরায় অন্নপূর্ণা শৈলন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শৈলেন্দ্র এবার আর সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। নিজে না গিয়া উমেশকে পাঠাইয়া দিলেন। উমেশ অন্নপূর্ণার নিকট গিয়া তখন অগত্যা তাঁহাকেই শৈলেন্দ্রের বাড়ী একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া আসিল।

অন্নপূর্ণা আসিলেন। তখন শৈলেন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে অন্নপূর্ণা আসিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। কনকলতার কনিষ্ঠা ভগিনী কুঞ্জলতাকে বিবাহ করিতে শৈলেন্দ্র কিছুতেই সম্মত হইলন না। শেষে অন্নপূর্ণা কহিলেন—"বাবা শৈলেন্দ্র, পরের উপকারের জন্যে তুমি এখন কি না করছ? আমি অনাথা বিধবা, কন্যাটীকে উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দিতে আমার ক্ষমতা নাই। তুমি যদি অনুগ্রহ করে বিয়ে কর, তবেই আমি কন্যাদায় হতে উদ্ধার হই। আমার উপকারের জন্যে না হয়, এ বিয়ে কর বাবা?"

শৈলেন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"কন্যার বিবাহের জন্যে আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। টাকা হলে পাত্রের অভাব হবে না। আমি সে টাকার ব্যবস্থা করে যাবো। আর কেবল কন্যার বিবাহ কেন—আপনার সাংসারিক ব্যয়ের ব্যবস্থাও আমি সেই সঙ্গে করে যাবো। আপনার যখন কোন অভাব হবে, আপনি উমেশকে তা জানাতে কুণ্ঠিত হবেন না।"

অন্নপূর্ণা তখন আর কি করিবেন? বিষণ্ন মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় কনক-লতা ধীরে ধীরে জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা, কুঞ্জের বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেল?"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—"আমাদের কি তেমন অদৃষ্ট মা, যে শৈলেন্দ্রের মতন জামাই পাবো? শৈলেন্দ্র আর বিয়ে কখন করবে না—সংসারীও হবে না। শুনছি সে নাকি ঘরসংসার সমস্ত পরিত্যাগ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবে। সে কথা শুনে আমি লোকলজ্জার মাথা খেয়ে নিজে তাকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলুম। আমি এ দায় হতে উদ্ধার হতুম, আর এমন একটা সোণার সংসারও ভেসে যেতো না। না—তা কিছুতেই হলো না—শৈলেন্দ্র আর কোন মতেই সংসারী হবে না।"

তখন ধীরে অতি ধীরে কম্পিতকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে কনক-লতা কহিল—"কেন সংসারী হবে না—তার কারণ কিছু জান মা?"

অন্নপূর্ণা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"জানি মা—খুব জানি, কিন্তু তুমি আর কখন সে কথা মুখে এনো না। তোমার মুখে আর কখন যেন আমার সে কথা শুন্‌তে না হয়। জানি মা—আমি সব জানি—শৈলেন্দ্র মানুষ নয়—শৈলেন্দ্র দেবতা। কিন্তু তুমি জেনো—শৈলেন্দ্র মনুষ্যাকারে বিষধর সর্প! শৈলেন্দ্র আজ নিজমুখেই বলছে—সে কুঞ্জের বিয়ের সমস্ত ব্যয় দিবে। আমাদের সাংসারিক খর-চেরও সে বন্দোবস্ত করে যাবে। সুতরাং তার মতন আমার হিতৈষী আর এ পৃথিবীতে নাই। শৈলেন্দ্র আমার যতদূর হিতৈষী হ'ক না কেন—তুমি মনে মনে স্থির জেনো—শৈলেন্দ্র তোমার পরম শত্রু—তার মতন তোমার শত্রু আর এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সকরুণ স্বরে কনকলতা কহিল—"আমার মরণ নাই কেন মা?" চক্ষের জল মুছিয়া জননী উত্তর করিলেন—"এখনও আমার ভোগের যে অনেক বাকি আছে মা।"

* * *

পরদিন সকলে শুনিল—শৈলেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সে সংবাদ গ্রামের যে শুনিল, সেই কাঁদিল—কেবল নন্দ ডাক্তারের আনন্দের সীমা ছিল না। তার পর কনক-লতা ক্রমে ক্রমে শুকাইতে আরম্ভ করিল।

সমাজ-চিত্র।

মানবী না দানবী?

[১]

কি সুন্দর!

সুনীল নির্ম্মল আকাশের পূর্ণচন্দ্র কি সুন্দর! স্বচ্ছ সরোবরের প্রস্ফুটিত কমলিনী কি সুন্দর! আর ঐ অবেণীসংবদ্ধ-কুন্তল বেষ্টিত বিভাবতীর মুখখানি কি সুন্দর! নগেন্দ্রনাথ এক দৃষ্টে অনিমেষনয়নে সেই মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন কি সুন্দর!

অকালে মেঘোদয় দেখিলে, চাতকিনী যেরূপ আনন্দে বিহ্বল হয়, অসময়ে নগেন্দ্রনাথকে আসিতে দেখিয়া বিভাবতীও কিছুক্ষণ সেইরূপ আনন্দে বিহ্বল হইয়া রহিল। তার পর অধরপ্রান্তে বৈদ্যুতিক হাসির সঙ্গে সঙ্গে বিভাবতী বীণাঝঙ্কারনিন্দিতস্বরে কহিল—"আজ যে এত সকাল নগেন্দ্র?"

নগেন্দ্র তখন বিষণ্নমুখে দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত উত্তর করিলেন,—"আমার বাড়ী নিয়ে যেতে বাবা এসেছেন। আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমায় বাড়ী যেতে হবে। তাই বিভা, বি-দা-য়—"

নগেন্দ্রনাথের মুখের কথা মুখেই রহিল। এ দিকে এ কি বিভ্রাট! নির্ম্মল আকাশের পূর্ণচন্দ্র অকস্মাৎ যেন রাহুগ্রস্ত হইল! নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে প্রস্ফুটিত কমলিনী যেরূপ শুষ্ক ও মলিন হয়, নগেন্দ্রনাথের পর্ব্বোক্ত কথায় বিভাবতীর প্রফুল্লমুখকমলও সেইরূপ শুষ্ক ও মলিন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তারপর ছিন্নতার বীণার শব্দের ন্যায় কম্পিতকণ্ঠে বিভাবতী কহিল,—"আমি তোমায় অনেক বারণ করেছি, আর বারণ কর্‌বো না—কবে আস্‌বে নগেন্দ্র?"

নগেন্দ্র। তোমায় ছেড়ে আর কতদিন থাক্‌বো বিভা? আমি যত শীঘ্র পারি আস্‌বো।

বিভা। নগেন্দ্র, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, আমি ছাড়া আর কাকেও বিয়ে কর্‌বে না। তাই আজ আমি দু' বৎসর তোমার অপেক্ষা করে আছি। তবে তোমার মুখ দেখেই এতদিন ধৈর্য্য ধরতে পেরেছি। তুমি বাড়ী চলে গেলে, কি করে থাক্‌বো?

বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রু বিভাবতীর নয়নপ্রান্ত হইতে গণ্ডদেশে গড়াইয়া পড়িল। সেই অতি ক্ষুদ্র বিন্দুদ্বয়ের পতনে, নগেন্দ্রের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল! নগেন্দ্র তখন পতনোন্মুখ অন্য অশ্রুবিন্দুটি স্বহস্তে মুছাইয়া দিয়া কহিল—"আর এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই সে প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বো—বিভা। এই বৎসর আমাদের শেষ পরীক্ষা। আমি ডাক্তারীটা পাস হয়ে গেলে, আর কাকেও ভয় কর্‌বো না।"

বিভাবতী তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"আমি তো অকুল-

পাথারে ভেসেছি! এখন ঈশ্বরের মনে কি আছে, তা তিনিই জানেন।”

নগেন্দ্র। আমায় অবিশ্বাস করো না বিভা। আমি কেবল তোমারই জন্যে হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করে, ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হয়েছি। গৃহ সংসার, বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন সমস্তই ত্যাগ করেছি।

নগেন্দ্রনাথের এই কথায় বিভাবতীর সেই বিষণ্ণমুখকমল শিশিরাভিষিক্ত পদ্মের ন্যায় ঢল ঢল করিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন—বিভাবতীর বিষাদ-মলিন মুখ-খানিও কি সুন্দর!

নগেন্দ্রনাথ হিন্দুকুলচূড়ামণি রামেশ্বর শিরোমণির একমাত্র পুত্র; আর বিভা-বতী—আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা।

[২]

দুই বৎসরের পর শিরোমণি মহাশয় অনেক কষ্টে পুত্র নগেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে গৃহে আনিলেন। পুত্রকে দেখিয়া শিরোমণি মহাশয়ের গৃহিণী কাঁদিয়া আকুল হইল। শিরোমণি মহাশয় হাসিতে হাসিতে পত্নীকে কহিলেন,—“আর কেঁদে কি হবে মাগী? কার কাছে কাঁদ্‌বি? আমাদের সে নগু কি আর বেঁচে আছে? সে মরে, এখন একটা ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে! আরও শুনে এলেম—এখন তার ঘাড়ে একটা শাকচুন্নীও চেপেছে!”

শিরোমণি মহাশয়ের এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্যে গৃহিণীর ক্রন্দনের মাত্রার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—“একান্তই যদি মরা ছেলে বাঁচাতে চাস্, তবে শীগ্‌গীর ছেলের বিয়ে দেবার উদ্যোগ কর মাগী।”

তার পর, কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, ব্রাহ্মণ দুই তিন দিনের মধ্যেই, গোপনে পুত্রের বিবাহের দিন স্থির করি-লেন। নগেন্দ্রনাথ প্রথমে এ বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিল, এমন কি, গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবারও সুযোগ দেখিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাহার জননী, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ক্রন্দন অবলম্বন করিলেন। পিতা শিরোমণি মহাশয়ও এদিকে মধ্যে মধ্যে সেইরূপ বাক্যবাণ ছাড়িতে লাগিলেন,—“আরে মাগী! কেবল রোদন করিস্ কেন? ঐ রোদনের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু অনুতাপও কর্।”

শেষে, পিতার এইরূপ বাক্যবাণে—আর জননীর ক্রন্দনে, পুত্র বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। তখন সেই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দর মুখ-খানি কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় একদিন গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন,—“দেখ্‌লিরে মাগী, আমার বউ-মা কেমন বিশল্যকরণী দেখ্—আমার মরা ছেলে বেঁচে উঠেছে দেখ্!”

[৩]

কলেজের ছুটি ফুরাইলে নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু এবার লজ্জায় কলিকাতায় আর বাসা করিলেন না। ভবানীপুরে কোন আত্মীয়ের বাসায় গিয়া উঠিলেন।

এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। তাঁহার শেষ পরীক্ষার আর তিন মাস মাত্র বিলম্ব। এমন সময় এক দিন রাত্রে তিনি হাঁসপাতালে “ডিউটি” (duty) খাটিতে-ছেন, হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল! মূর্ত্তির সেই রোষকষায়িতনেত্র দেখিয়া, তিনি ভয়ে

অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কবর হইতে কোন মৃত ব্যক্তি সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেও তিনি ভয়ে এতদূর অভিভূত হইতেন না! নগেন্দ্রনাথ প্রথমে ভাবিলেন—সম্মুখের দৃশ্য বুঝি স্বপ্ন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সেই স্ত্রীমূর্ত্তি কথা কহিল,—"নগেন্দ্র! আমায় চিনিতে পার?"

সে কণ্ঠস্বরে স্বপ্নের ভ্রম দূর হইল। নগেন্দ্র শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,—"চিন্‌তে পারবো না কেন? কিন্তু তুমি এখানে কেন বিভা?"

বিভা। আমি এখানে nurse আর midwifeএর কাজ শিখ্‌তে এসেছি। কিন্তু সেটা ছলনা মাত্র; আমার এখানে আসা—কেবল তোমারই জন্যে! তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে কেন? আমাদের সমাজের মুখে কালি দিলে কেন?"

নগেন্দ্রের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল! দুই তিনটা ঢোক গিলিয়া কহিলেন—"আমার বাপ-মার- অনুরোধে।"

বিভা। ধর্ম্মের নিকট কি তোমার বাপ-মা বড় হলো?

নরেন্দ্রনাথের তখন মনে হইল,—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

নগেন্দ্র অমনি জোর করিয়া কহিলেন, —"আমার ধর্ম্ম বলে—আমার বাপ-মাই বড়। তোমায় আরও স্মরণ করে দিচ্ছি —আমি এখন আমার ধর্ম্মপত্নীকে লাভ করেছি! এখন আমি বিবাহিত।"

বিভাবতী বিদ্রূপস্বরে ঘাড় হেলাইয়া কহিল,—"সে কথা আমার মনে রাতদিন জাগ্‌ছে। সে জন্যে কোন ভয় নাই—আমিও বিবাহিতা!"

নগেন্দ্রনাথ সাশ্চর্য্যে বিভার মুখের দিকে চাহিলেন! বিভা তখন গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিল,—"তোমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে, নগেন্দ্র, আমিও গায়ের জ্বালায় একটা বিবাহ করে ফেলেছি। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—সে আমার বিবাহ নয়—একটা গলগ্রহ মাত্র। আমি সে স্বামী চাই না, আমি তোমায় চাই।"

নগেন্দ্রনাথ ত অবাক্!

[৪]

তিন মাস পরে নগেন্দ্রনাথ, ডাক্তারী এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজেই এক চাক্‌রী গ্রহণ করিলেন। বিভা তখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। নগেন্দ্রনাথ অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, যখন তাঁহারা উভয়েই বিবাহিত, তখন এরূপ সঙ্কল্প মনে স্থান দেওয়াও মহাপাপ। কিন্তু বিভা সে কথা বুঝিল না। সুতরাং নগেন্দ্র একাকী আর বিভার নিকটে যাইতে সাহসী হইলেন না; পরন্তু যাহাতে বিভার কোন সংস্রবে না থাকিতে হয়, প্রাণপণে কেবল সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। বিভার চেষ্টা কিন্তু অন্যরূপ! কোন কথা তাহার জিজ্ঞাস্য থাকিলে, সে নগেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিত না। জিজ্ঞাস্য না থাকিলেও ছল করিয়া নগেন্দ্রনাথের কাছে আসিতেও ছাড়িত না!

এইরূপে কিছু দিন গেল। তার পর নগেন্দ্রনাথ কলিকাতার হাঁসপাতাল হইতে হঠাৎ কানপুরের সরকারী হাঁসপাতালে বদ্‌লি হইলেন। সুতরাং নগেন্দ্র কেবল দৈব ঘটনায় এ যাত্রা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন।

কানপুরে চারি-পাঁচ বৎসর থাকিতে

না থাকিতেই সেখানে নগেন্দ্রনাথের বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। নগেন্দ্র তখন সপরিবারে কানপুরে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সরকারী বেতন ব্যতীত চিকিৎসা-ব্যবসাতেও তিনি মাসে পাঁচ ছয় শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন।

এক দিন প্রাতে তিনি চিকিৎসার্থে বাহির হইবেন, এমন সময় একজন লোক নিম্নলিখিত একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিল:—

"প্রিয় নগেন্দ্র বাবু,

আমার স্বামী সঙ্কটাপন্ন পীড়ার দরুণ আমি এখানে হাওয়াপরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এখানে আসিয়াও বড় বিপদাপন্ন। পত্রপাঠ এই লোকের সঙ্গে আসিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি

অনুগতা—শ্রীবিভাবতী ঘোষ।"

ব্রাহ্মণের কন্যার এখন উপাধি হইয়াছে—ঘোষ! কিন্তু বিভাবতী ঘোষকে নগেন্দ্রনাথ চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিলেন বলিয়া, পত্রপাঠান্তে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তার পর, সেই লোককে গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী গঙ্গাতীরে একখানা বাঙ্গালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—বিভাবতী আসন্নমৃত্যু স্বামীকে কোলে লইয়া কাঁদিতেছে। নগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বিভা আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি রোগীকে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু কি যে রোগ, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শুনিলেন—রোগী অজীর্ণ রোগে আজ তিন মাস কাল কষ্ট পাইতেছে। রোগী তখন বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, নগেন্দ্রনাথ বড় ভীত হইলেন। সে দিন আর অন্য রোগী দেখিতে যাইতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি ঔষধ আনিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দুই প্রহরের সময়, পত্নীকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া বিভাবতীর স্বামীর মৃত্যু হইল। বিভাবতী কাঁদিয়া আকুল। হা ভগবান!

[৫]

ভগবান্ আমাদের প্রার্থনা শুনিয়াছেন। সেই নিরাশ্রয়া অবলা বালা আকুলসাগরের কূল পাইয়াছে। স্বয়ং নগেন্দ্রনাথ এখন সেই নিরাশ্রয়ার আশ্রয় ও অবলার বল হইয়াছেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া এবং তাঁহার চেষ্টায়, মিসেস বি, ঘোষ কানপুর সহরের একজন বিখ্যাত ধাত্রী হইয়াছেন—ধাত্রী ও রোগী-শুশ্রূষা-কার্য্যে তাঁহার সুখ্যাতি আর সহরের মধ্যে ধরে না। বিভাবতী, কানপুরের কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী সকলেরই সঙ্গে মিশিতে পারে—সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা কয়; সুতরাং ছয় মাসের মধ্যেই বিভাবতীর পসার—পূর্ণিমার চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রমদা নয় মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সুতরাং প্রমদার সূতিকাগারের শুশ্রূষার ভার পড়িল—মিসেস বি, ঘোষ ওরফে বিভাবতীর উপর। যথাসময়ে প্রমদার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। অনেক কষ্টে তিন দিন প্রসব বেদনার পর প্রমদা এক পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশুলীলা সম্বরণ করিল! তখন প্রসূতিকে লইয়াই

সকলে ব্যস্ত, সুতরাং শিশুপুত্রের মৃত্যুর জন্যে কেহ আর দুঃখিত হইল না, নগেন্দ্রনাথ পত্নীর জন্যে বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। ধাত্রী বিভাবতী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। এত যত্ন, এত কষ্ট স্বীকার বেতনভোগী ধাত্রীতে কখনই করে না। বার দিনের দিন স্বামীর অশ্রুসিক্ত প্রমদার দেহ হইতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন চক্ষু চাহিয়াই সম্মুখে বিভাবতীকে দেখিতে পাইলেন, আর কর্ণে শুনিলেন—"বল হরি—হরি বোল।" সুতরাং নগেন্দ্রনাথ পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

[৬]

নগেন্দ্রনাথ বড়ই অসুস্থ। কিন্তু বিখ্যাত শুশ্রূষাকারিণী মিসেস্ ঘোষ দিবারাত্রি তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা। সুতরাং সে অসুস্থতা আর কতদিন থাকিবে? আর শোক কিছু চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগজনিত শোক! অচিরে নগেন্দ্রনাথের সে শোক ও অসুস্থতা দূর হইল। সে শুশ্রূষার কি মোহিনী শক্তি দেখ! শুধু শোক ও অসুস্থতা নহে—সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিশ্বাসেরও ভিত্তি টলিল। নগেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন! স্রোতস্বিনীর তীব্র স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণ ভাসিয়া গেল। পত্নীবিয়োগের এক মাস পরেই, কাণপুরের ব্রাহ্মমন্দিরে একদিন মহাসমারোহে নগেন্দ্রনাথের সহিত বিভাবতীর শুভ পরিণয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের কন্যা পুনরায় ব্রাহ্মণের গৃহিণী হইল—মিসেস বি, ঘোষ এখন মিসেস বি, ভট্টাচার্য্য হইল। আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

যখন বিভাবতী নগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপ্রণয় পূর্ণমাত্রায় সংস্কার করিতে সমর্থা হইল—যখন বিভাবতীর সেই প্রফুল্ল মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ পুনরায় ভাবিতে আরম্ভ করিলেন—"আহা! মরি মরি ঐ মুখখানি কি সুন্দর!" এরূপ সময় এক দিন বিভাবতী গরবে গরবিণী আর অভিমানে মানিনী হইয়া হাসিয়া জ্যোৎস্না ছড়াইতে ছড়াইতে বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গির সহিত কহিল,—"কেমন—এখন তুমি আমার হয়েছ তো?"

নগেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"সকলই দয়াময়ের অপূর্ব্ব দয়ায়।"

বিভাবতী তখন হাসির ঝলকে ঢুলিতে ঢুলিতে কহিল—"কেবল সেই দয়াময়ের অপূর্ব্ব দয়া নয়, এর সঙ্গে আমার একটু আধটু দয়াও মিশ্রিত ছিল।"

নগেন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত কহিল,—"কি রকম!"

বিভাবতী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল,—"আমিইতো slow poison খাইয়ে আমার স্বামীর অজীর্ণ রোগ করেছিলুম। কল্‌কেতায় ধরা প'ড়বার ভয়ে আর তোমাকে পাবার জন্যে এই কানপুরে এনে তোমারই সুমুখে তাকে মেরে ফেললুম।"

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত-নেত্রে অবাক্ হইয়া বিভাবতীর তাৎকালিক সেই হাস্যময় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিভাবতী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"তাতেই কি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ছাই? তখন দেখলুম—তোমার প্রমদাই আমাদের সুখের বিষম কণ্টক। তাই প্রমদাকে আঁতুর ঘর থেকে তোমার শোবার ঘরে আর ঢুকতে দিলুম না।"

সমাজ-চিত্র।

কি অপূর্ব্ব দয়া! অকস্মাৎ এক কাল ভুজঙ্গী যেন দৌড়িয়া আসিয়া নগেন্দ্রনাথের বক্ষঃস্থল সজোরে দংশন করিল। সে দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া নগেন্দ্রনাথ সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—কি ভীষণ ভাবিলেন—বিভাবতী মানবী না দানবী? এইবার আমরা আর একবার বলি—বিভাবতীর মুখখানি কি সুন্দর!

সমাজ-চিত্র।

হরগৌরী মিলন।

[১]

এত করিয়াও ঘটক মহাশয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার পাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ইংরেজী শিক্ষিত পাত্রের পক্ষপাতী নহেন। তিনি নিজে যেমন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সেইরূপ ব্রাহ্মণের ছেলে চাহেন। তার পর পাত্রটিও—"শ্রুতবান ও শীলবান্' হওয়া আবশ্যক। কেবল ইংরেজী—বি, এ, এম্ এ পাশ করিলে চলিবে না। "পাত্রের পিতার আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধেও বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি ছিল। তবে উচ্চপদস্থই হউক, আর নিম্নপদস্থই হউক এই 'চাকুরে বাবুদিগের' প্রতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। কেবল চাকুরীগতপ্রাণ অপেক্ষা উপস্বত্বগত বা ব্যবসাগত প্রাণের মূল্য তিনি অধিক মনে করিতেন। এরূপ বংশের ছেলে হইলে, তাঁহার বিশ্বাস—সে ছেলের স্বভাবচরিত্র নিশ্চয়ই ভাল হইবে। সুতরাং পাত্রের স্বভাব চরিত্রের প্রতিও তাঁহার প্রকারান্তরে প্রখর দৃষ্টি ছিল।

রামরতন ঘটক মহাশয় এ বয়সে অনেক বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনোমত পাত্র তিনি আর সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। এ সৃষ্টি ছাড়া পছন্দের অনুসন্ধান করিতে ঘটক মহাশয় কোন ত্রুটি করেন নাই! আর পাত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইলেই যখন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পারিশ্রমিক ও পাথেয় দিতেন, তখন ঘটক মহাশয় বারবার বিফলমনোরথ হইয়াও এ কার্য্যে নিরুৎসাহ হন নাই।

শেষে, দেবগ্রামের বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনোনীত হইল। এইবার ঘটক মহাশয়ের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

[২]

আজ ৩রা বৈশাখ। বরপক্ষের পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদের দিন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুরু, পুরোহিত এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। যথাসময়ে দেবগ্রাম হইতে পাত্রের পিতা গুরু, পুরোহিত এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত স্বরূপপুরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া গেল।

শুভক্ষণে উভয় পক্ষ একত্রিত হইলেন।

সে সভায় সম্বন্ধের তখন আলাপ পরিচয় চলিতে লাগিল। এমন সময় আমাদের ঘটক মহাশয় দেনা পাওনার কথাটা উত্থাপন করিলেন। সে কথা শুনিয়া পাত্রের পিতা মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—কন্যাকর্ত্তা তাঁহার জামাতা ও কন্যাকে যা দিয়ে সন্তুষ্ট হবেন, আমি তাহাতেই রাজী। এ সম্বন্ধে আমি কোন ফর্দ্দাফর্দ্দির আবশ্যক দেখি না।"

বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় কহিলেন—"দেখুন মুখুর্য্যে মহাশয়, এ সম্বন্ধে একটা স্থির থাকা ভাল। কারণ আপনি মনে মনে কিছু পাবার আশা করে থাকেন, আর আমি যদি সে পক্ষে অপারক হই, তা হলে উভয় পক্ষেরই সেটা শুভ হবে না।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আপনার কন্যাকে যখন আমি পছন্দ করেছি, আর আপনার সঙ্গে এরূপ কুটম্বিতা করবার যখন আমি অভিলাষী হয়েছি—তখন কিছু পাবার আশা আমিত আমার মনে কখনই স্থান দিই নাই। পাবার আশার মধ্যে আপনার কন্যাটি। আপনার কন্যাকে আপনি যা ইচ্ছা দিতে পারেন, সে পক্ষে আমার দেখ্‌বার কোন আবশ্যক নাই। আমার পুত্রকে আপ্‌নি একটি হরীতকী দক্ষিণা দিয়ে বিবাহ দিবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হবো।"

তখন চারিদিক হইতে "সাধু—সাধু" রব উত্থিত হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না। তবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক আত্মীয় কহিলেন—"সকল বরকর্ত্তা যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতন ব্যবহার করেন, তবে আমাদের সমাজে আর কন্যাদায় বলে কোন পদার্থ থাকে না।"

তাহারই পোষকতা করিতে গিয়া বরপক্ষের কোন আত্মীয় কহিলেন—"পূর্ব্বে পিতৃমাতৃ দায় ছিল, এখন সেটা আর দায়ের মধ্যে গণ্য নয়—এখন এক কন্যাদায়ই আমাদের সমাজের সর্ব্বপ্রধান দায় হয়েছে। সাহেবদের কিন্তু বেশ—কন্যার বিয়ের ভাবনা তাঁহাদের আদৌ ভাব্‌তে হয় না।"

তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"সে কি কথা মহাশয়? আমাদের বিবাহ পদ্ধতির মতন এমন সুন্দর পদ্ধতি আর কোন দেশের কোন জাতির মধ্যে নাই। আমাদের বিবাহত এক রকম নয়। বলুন না ঘটক মহাশয়—আমাদের কত রকম বিবাহ পদ্ধতি আছে। এই উপলক্ষে সে সব কথার আলোচনা হওয়া ভাল। আর আপ্‌নি থাক্‌তে আমার বলা ভাল দেখায় না।

তখন ঘটক মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"স্বীকার ও সংস্কার—আমাদের বিবাহের—এই দুইটি প্রধান অঙ্গ। 'ইয়ং মম'—ইত্যাকার জ্ঞানকেই স্বীকার বলে, আর—দেবার্চ্চনা, পিত্রর্চ্চনা, হোম ও দক্ষিণা—এইগুলি হলো—সংস্কারের অঙ্গ। বিবাহ করিতে হইলে প্রথমে কন্যালাভ করিতে হয়। এই কন্যালাভ আট প্রকারে হয়ে থাকে। প্রথম—ব্রাহ্ম। কন্যা সম্প্রদাতা শ্রুতবান ও শীলবান পাত্রের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়ে, তাঁকে আহ্বান-পূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা পূজাপূর্ব্বক দানান্তে যে প্রতিগ্রহ, তাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। দ্বিতীয়—দৈব। যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিককে দক্ষিণার সহিত কন্যাদানকে দৈব বিবাহ কহে। তৃতীয়—আর্ষ। বরের নিকট গোমিথুন গ্রহণ করে, সেই গোমিথুন আবার দক্ষিণা-

স্বরূপ প্রদানে যে কন্যাদান—তাকে আর্ষ বিবাহ কহে। চতুর্থ—প্রাজাপত্য। কন্যা-প্রার্থী বরকে 'সহ তৌ চরতাং ধর্ম্মঃ' এই কথা বলে যে কন্যা দান। পঞ্চম—আসুর। বরের নিকট ধন গ্রহণ করে যে কন্যা-দান। ষষ্ঠ—গান্ধর্ব্ব। কন্যা স্বয়ং বরের সহিত চুক্তি করে আপনাকে অর্পণ। সপ্তম—রাক্ষস। বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ। অষ্টম—পৈশাচ। ছলপূর্ব্বক কন্যাহরণ অর্থাৎ, নিদ্রিতা, প্রমত্তা বা মত্তা কন্যা হরণ। এই আটপ্রকার বিবাহই আমাদের সমাজে এক সময় প্রচলিত ছিল।"

তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"দেখুন দেখি মহাশয়, এই আটপ্রকার ব্যতীত আর কোন রকমে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কি না। বিবাহ সম্বন্ধে কত উদারভাব আমাদের শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থাতে দেখুন।"

এই সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুরোহিত কহিলেন—"কন্যা আশীর্ব্বাদের সময় উপস্থিত। অগ্রে সেই শুভকার্য্য হ'ক।"

তখন উপস্থিত সকলের অনুমতি লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্তঃপুর হইতে কন্যাকে আনিতে চলিলেন।

[৩]

কন্যা সভাস্থ হইবার পূর্ব্বে—গৃহ দেবদেবীগণকে প্রণাম করিল। তাহার পর সভায় আসিয়াও সকলকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামের কোন ত্রুটি হইল না প্রচলিত প্রথা অনুসারে—একজন কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন—"তোমার নাম কি?"

কন্যা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী।"

কন্যার সুখ্যাতি এই সময় চারিদিক হইতে আরম্ভ হইল। ঘটক মহাশয় তখন কহিলেন—"কেবল রূপবতী নয়—কন্যাটি সর্ব্ব-সুলক্ষণা। আর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ শিক্ষাও দিয়াছেন।"

যে ব্যক্তি নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন—"কতদূর পড়াশুনা করা হয়েছে মা?"

কন্যা এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর করিল না। কিন্তু এই সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—"আমি আমার কন্যাকে লেখাপড়া শিক্ষা আদৌ দিই নাই। আমার কন্যার বর্ণ-জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। তবে সাধ্যমত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিয়েছি। কন্যার পক্ষে লেখা-পড়া শিক্ষা অপেক্ষা সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার শিক্ষাই আমি প্রধান শিক্ষা মনে করি।"

সে কথা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"আমারও তাই মত। আমি এইরূপ কন্যাই চাই।"

তখন উপস্থিত সকলেই সেই মতেই মত দিলেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া উভয় পক্ষের গুরুপুরোহিত ও উপস্থিত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর অনুমতি লইয়া তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় রজতখণ্ডের সহিত ধান-দূর্ব্বার দ্বারা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্যান্য সকলের আশীর্ব্বাদের পর, কন্যা ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

[৪]

স্বরূপপুরের চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত লোক। আজ ২৮শে বৈশাখ বুধবার তাঁহার কন্যা নবদুর্গার বিবাহ। সমস্ত গ্রাম আজ আনন্দে ও উৎসবে পরিপূর্ণ। দূর দূরান্তর হইতে এই বিবাহ উপলক্ষে অনেক কুটুম্ব কুটুম্বিনীও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গৃহ আজ প্রাতঃকাল-তেই আনন্দকলরবে প্রতিধ্বনিত। তাঁহ

অবস্থানুরূপ আয়োজনের কোন ত্রুটি দেখা যায় না।

প্রাতঃকাল হইতে—চারিদিক হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আসিয়া তাঁহার ভাণ্ডার-গৃহ পরিপূর্ণ হইতেছে। সে সকল দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভারও উপযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এদিকে ভেয়ানশালায় সুদক্ষ ব্রাহ্মণের দ্বারা নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে। রন্ধনশালায়ও সেইরূপ নানা-প্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতেছে। একটি স্বতন্ত্র গৃহে কেবল দধি, দুগ্ধ ও ক্ষীর ছানা প্রভৃতি ভাণ্ডারজাত করা হইতেছে। অপর এক গৃহে ভাঁড়, খুরী ও কদলীপত্র প্রভৃতি স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রায় এক সহস্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় সেই কারণ প্রায় দেড় সহস্র লোকের আহারাদির আয়োজন করিয়াছেন

রাত্রি একপ্রহরের পরেই বিবাহের লগ্ন। সুতরাং বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর অভ্য-র্থনার বন্দোবস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৈকালেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এক-গৃহে উভয়পক্ষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বসি-বার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রকাণ্ড পূজার দালানে আজ বর ও কন্যা পক্ষের ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হইয়াছে। সেইরূপ ব্রহ্মণেতর অন্যান্য জাতির স্থানও স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল স্থানের অভ্যর্থনাকারী ও তামাক-দিবার ভৃত্য সকলও স্বতন্ত্রভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। পূজার দালানের সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে পদপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা ছিল।

সন্ধ্যার পরেই বহুলোকজন সঙ্গে লইয়া র দেবগ্রাম হইতে আসিয়া পৌঁছিল। খ ও উলুধ্বনিতে সেই প্রকাণ্ড বাড়ী ধন কম্পিত হইতে লাগিল। সদর দরজায় দাঁড়াইয়া গললগ্নবাসে জোড়হস্তে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং যথাবিহিত সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ প্রথমেই স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালন করাইতে নিযুক্ত হইল। অপর ভৃত্যগণের মধ্যে তামাক সাজিবার ধূম পড়িয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে ন্যায়, স্মৃতি ও দর্শনের নানাবিধ প্রশ্ন ও উত্তর চলিতে লাগিল। কোন রূপ বিবাদ বিসম্বাদ নাই। কারণ পূর্ব্বাহ্নেই একজন মধ্যস্থ মনোনীত হইয়া-ছিলেন। জয় পরাজয় সম্বন্ধে মধ্যস্থের মীম... উভয় পক্ষকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উভয়পক্ষের ঘটকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও নানা-প্রকার প্রশ্নোত্তর ও কুলচী আওড়ান চলিতেছিল। আজ সেই পক্ষের কর্ত্তা হইয়াছেন—আমাদের ঘটক চূড়ামণি—রামরতন ঘটক।

বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী মহলেও নানা প্রকার আলাপ পরিচয় চলিতেছিল। বিশেষতঃ উভয়পক্ষের বালক মহলেই—প্রশ্ন ও উত্তরের বিশেষ ঘটা দেখা গেল। তথায় নানাপ্রকার ঠকান প্রশ্নের দ্বারা উভয় পক্ষের বালকগণের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরীক্ষা চলিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণের সে দিকেও দৃষ্টি ছিল।

লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় কন্যা পাত্রস্থ করিবার জন্যে ব্যস্ত হইলেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থ সকলের অনুমতি গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাত্র লইয়া চলিলেন। শুভ-ক্ষণে কন্যা পাত্রস্থ হইল। তার পর সে রাত্রে স্ত্রীলোকদিগের বাসর ঘরেরও ব্যবস্থ

[illegible]

[৫]

[illegible] প্রান্তে বরবিদায়ের সময় [illegible] কাঙ্গালী উপস্থিত হইয়াছিল। বরকর্তা যথাসাধ্য সে সকল বিদায় করিলেন। তার পর উভয়পক্ষের গুরুপুরোহিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ঘটকনাপিত প্রভৃতিরও বিদায়—যথানিয়ম সম্পন্ন হইয়া গেল। গ্রামদেবতা, চতুষ্পাঠী, স্কুল, পাঠশালা, বারোয়ারী প্রভৃতির বিদায় করিতেও বরকর্ত্তা কোনরূপ কৃপণতা করিলেন না। কারণ, কোনরূপ চুক্তি না থাকিলেও বরকর্ত্তা আশাতীত অর্থলাভ করিয়াছিলেন। আর এক দলের বিদায় হইলেই বর পক্ষের বিদায় কার্য্য শেষ হয়। বরপক্ষের সঙ্গে কতকগুলি লাঠিয়াল আসিয়াছিল, আর পরদিন বিদায়ের সময় স্বরূপপুর এবং ঐ অঞ্চলেরও অনেকগুলি লাঠিয়াল একত্রিত হইয়াছিল। উভয়পক্ষ হইতেই তাহাদের বিদায়ের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু [illegible]রা পরস্পরের বিদ্যার পরীক্ষা না দিয়া [illegible]ন মতেই বিদায় লইতে স্বীকৃত হইল [illegible] [illegible] বিদ্যার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সে এক ভীষণ ব্যাপার! উভয় পক্ষের বাছা বাছা লোক লইয়া লাঠিখেলা আরম্ভ হইল। লাঠিখেলায় [illegible] কত রকম কায়দা আছে, দেখিয়া [illegible] একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। তারপর যথানিয়মে তাহাদের বিদায় করা হইল। বেলা অধিক হয়—দেখিয়া বরকর্তা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, ঠাকুর প্রভৃতি প্রণামের পর, অন্তঃপুর হইতেই বরকন্যা আসিয়া উপযুক্ত যানে আরোহণ করিল। আশীর্ব্বাদ ও চক্ষের জলের সহিত পুরবাসিনীগণ তাহাদের বিদায় দিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া এই সময় কিন্তু সেই ধীর ও স্থির প্রকৃতির বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। আজ হইতে তাঁহার নবদুর্গা পর হইয়া গেল—এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবা মাত্র ব্রাহ্মণ আর চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিলেন না।

যথাসময়ে বরকন্যা আসিয়া দেবগ্রামে পৌঁছিল। তখন গ্রামের স্ত্রীপুরুষ বরক'নে দেখিবার জন্যে একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে বরক'নে যে দেখিল, সেই বলিল,—এ যেন হরগৌরী মিলন!

সমাপ্ত।